উপজাতি কবিরাজ ও অচাইদের

বনৌষধি চিকিৎসা ও চাষপদ্ধতি

ড. পীযূষকান্তি পাল

Tribal Research & Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

উপজাতি কবিরাজ ও অচাইদের

বনৌষধি চিকিৎসা ও চাষপদ্ধতি

ড. পীযূষকান্তি পাল

Tribal Research & Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

Published by :
Tribal Research & Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

© Tribal Research & Cultural Institute

Cover Design :
Shibendu Sarkar

Edition :
February 2005

Processing & Printing :
Parul Prakashani
Akhaura Road, Agartala.

Price : 30.00

ভূমিকা

প্রাচীনকালে মানুষ সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাসের পাশাপাশি নানারূপ রোগশোকে আক্রান্ত হত। ফলে প্রকৃতির কোলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ভেষজ উদ্ভিদ চিহ্নিত করে পাহাড়ী মানুষেরা। ত্রিপুরার উপজাতিরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না, বরং এককদম এগিয়েছিল। ঘন অরণ্যে বসবাসকারী মানুষের জন্য না ছিল কোনো চিকিৎসালয় বা চিকিৎসক। এজন্য যুগ যুগ ধরে উপজাতি পাহাড়ী লোকেরা নানারূপ ভেষজ ঔষধ তৈরি করে গ্রাম-পাহাড়ের লোকেদের জন্য কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করে যা আজও চলছে।

বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতিতে মানুষ যেমন প্রকৃতির গাছ-গাছালি বা লতা-পাতাকে পূজো করে ও ভালোবাসে তেমনি ভেষজ উদ্ভিদগুলিকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার করে। বনৌষধির ব্যবহার উপজাতি জীবনে বিধাতার এক আশীর্বাদস্বরূপ। এগুলিকে রক্ষা করে, এগুলির গুণমান বৃদ্ধি ও বিশ্লেষণ করা তথা বাণিজ্যিক চাষের অনুসন্ধানকল্পে প্রয়োজনীয় সেমিনার ও অণুসন্ধানের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে এরাজ্যে।

এরাজ্যের বিশিষ্ট উদ্যান, কৃষি ও ভূমি প্রযুক্তিবিদ তথা প্রাক্তন ডাইরেক্টর ও উপদেষ্টা ডঃ পীযূষকান্তি পাল ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড়ের প্রায় চারদশক সময়ের চাকুরী জীবনের এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতায় উপজাতি কবিরাজ ও অচাইদের ব্যবহৃত বনৌষধির উপর এই বইখানা লেখেন। উপজাতি অনুসন্ধান বিভাগকে কৃতজ্ঞ করার পাশাপাশি ডঃ পাল ত্রিপুরার অবহেলিত উপজাতি কবিরাজ ও লুপ্তপ্রায় ভেষজ উদ্ভিদদের রক্ষায় সাহায্য করেছেন।

আমি আশাকরি যে শ্রদ্ধেয় ডঃ পীযুষকান্তি পালের এ প্রয়াস উপজাতি কবিরাজদের উৎসাহ ও নিষ্ঠা বাড়াতে, গ্রাম-পাহাড়ের দরিদ্রদের চিকিৎসার সুবিধা বাড়াতে এবং এরাজ্যের ভেষজ উদ্ভিদের রক্ষনাবেক্ষণ ও উন্নয়নে সাহায্য করবে। পাশাপাশি বইখানি সমাজের প্রতিটি লোকের ব্যবহার তথা প্রয়োজনে লাগবে।

— জিৎদাস ত্রিপুরা

(ডিরেক্টর, ট্রাইবল রিসার্চ অ্যান্ড কালচার ইনস্টিটিউট)

লেখকের নিবেদন

মানুষের সভ্যতা বিকাশের সময় থেকেই ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহারে রোগ নিরাময় পদ্ধতি শুরু হয়। বিশ্বের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্যময় ভেষজ উদ্ভিদ পাওয়া যায় যেগুলি আয়ুর্বেদ ; ঊনানী, সিদ্ধা, হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক, ইম্‌চি ইত্যাদি ঔষধি প্রায় সরাসরি ব্যবহৃত হয়ে আসছে বৈদিক যুগ থেকে। প্রাচীনকাল থেকে ত্রিপুরার উপজাতি কবিরাজরাও বিভিন্ন ভেষজ বা বনৌষধি ব্যবহার করে আসছেন গ্রাম পাহাড়ের লোকদের রোগ নিরাময়ের জন্য। তাঁদের জ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতি প্রায় বংশানুক্রমিকভাবে চলে এলেও বিজ্ঞান সম্মতভাবে তার উন্নতিকল্পে কোনো কালেই কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

২০০৫ সালের ৭ জানুয়ারি ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক দিন। এদিনটি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। দুদিনের জন্য ত্রিপুরার উপজাতি ও পাহাড়ি অঞ্চলের তথা রাজ্যের চল্লিশটি ব্লকের কবিরাজ ও অচাইদের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার শহিদ ভগৎ সিং যুব-আবাসে।

উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের উপজাতি গবেষণা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত দু-দিনের সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ও পাহাড়ি এলাকার কবিরাজ ও অচাইদের মানবকল্যাণকারী জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ধরে রেখে তার ভালোভালো গুণগুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিকশিত করা। ব্যবহৃত গাছগাছালিতে বা পদ্ধতিগত কোনো কুফল বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকলে সেগুলি চিহ্নিত করে দূর করা ও় গ্রাম পাহাড়ের লোকদের চিকিৎসার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা। পাশাপাশি সমস্ত প্রান্তিক ও পতিত জমিকে ব্যবহার করে পাহাড়ি অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা।

দূরদূরান্ত থেকে রাজ্যের ৪০টি ব্লকের এক দু-জন করে আগত কবিরাজ ও অচাইদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার শ্রী মিহির পাল মহাশয় জানান যে বনৌষধির পরিমাণ তথা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং সেগুলির গুণমান বিশ্লেষণের জন্য একটি পরীক্ষাগার স্থাপনের কাজ চলছে। এ-ছাড়া বনৌষধি থেকে বিভিন্ন ঔষধ এ রাজ্যে তৈরির ব্যবস্থাও চলছে যাতে এগুলি চাষ করে বিক্রি করা যাবে, রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে। রাজ্যের ভেষজ উদ্ভিদ বোর্ডের সদস্য সচিব জানান যে এই বোর্ড কয়েকটি নির্দিষ্ট ভেষজ উদ্ভিদের চাষের জন্য অনুদান দিচ্ছে এবং এগুলি পরে কিনেও নেবে। যেমন— (১) আমলকি, (২) বচ, (৩) শতমূলী, (৪) পিপুল, (৫) সর্পগন্ধা, (৬) আগর, (৭) চিরতা, (৮) কালমেঘ। মাননীয় উপজাতি-কল্যাণ মন্ত্রী উপস্থিত কবিরাজ ও অচাইদের সেমিনারের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়ে গ্রাম পাহাড়ের চিকিৎসার সুযোগ উন্নত করতে অনুরোধ করেন। তিনি এই সেমিনারের প্রথম উদ্যোক্তা বলে তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে উপস্থিত সব কবিরাজ ও অচাই ভাইয়েরা নিজেদের জ্ঞান মানব কল্যাণে অর্পণ করার সংকল্প নেন।

এরূপ মহতী, ঐতিহাসিক এবং সুদূরপ্রসারী জনকল্যাণকামী সেমিনারে রাত পর্যন্ত থেকে উপস্থিত প্রায় সমস্ত পাহাড়ি ও উপজাতি কবিরাজদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করে যা পেয়েছি তা ধরে রাখতে এই ছোটো পুস্তকে বর্ণনা করলাম।

—ড. পীযূষকান্তি পাল।

সূচিপত্র

- ❒ উপজাতি কবিরাজ ও অচাইদের নাম ও ঠিকানা ১
- ❒ বাসকল্লাই (বাসক) ৪
- ❒ কাখবুফাং (কালমেঘ) ৫
- ❒ চান্দুমা (সর্পগন্ধা) ৬
- ❒ কসম বিনাজি বা তুলসীকসম (তুলসী) ৭
- ❒ পিপুই (পিপুল) ৯
- ❒ শতমূলী (শতমূলী) ১০
- ❒ স্যামছোটা (থানকুনি) ১১
- ❒ নালজোড়া (হাড়জোড়া) ১২
- ❒ উসোনদুই (পুদিনা) ১৩
- ❒ ঘৃতকাঞ্চন (ঘৃতকুমারী) ১৪
- ❒ বচ (বচ) ১৫
- ❒ বাখলা (হরিতকী) ১৭
- ❒ থা বলং বা থাদুক (খাম আলু) ১৮
- ❒ বইরা (বহেড়া) ১৯
- ❒ বৃন্দাবন খুম কফুর (নয়নতারা) ২০
- ❒ চরন্দী (নিশিন্দা) ২১
- ❒ তোয়খা থাইসমু (তেলাকুচা) ২২
- ❒ ধুতুরা (ধুতুরা) ২৩
- ❒ লথ বা লেটক (ভেরন বা ভেরেন্ডা) ২৪
- ❒ পূর্ণদলাক (পুণনর্বা) ২৬
- ❒ কুশাকাথং (পাথর কুচি) ২৭
- ❒ আমচুকাই (আমরুল) ২৮
- ❒ দুখুপুই (গেঁদাল) ২৯
- ❒ কুইচাখা (কুরচি) ৩০
- ❒ আংগন (আকন্দ) ৩১
- ❒ সজন (সজিনা) ৩২
- ❒ কৃষ্মকলি (নীল অপরাজিতা) ৩৩
- ❒ আমলাই (আমলকী) ৩৪
- ❒ প্রোমোসনেল এবং বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ কর্তৃক নির্দিষ্ট ভেষজ উদ্ভিদসমূহ ৩৬
- ❒ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ভেষজ উদ্ভিদ চাষে আর্থিক সাহায্য ৩৯
- ❒ আর্থিক সাহায্যের জন্য দরখাস্তের নমুনা ৪১

❑ উপজাতি কবিরাজ ও অচাইদের কিছু নাম ও ঠিকানা ❑

কবিরাজের নাম	ঠিকানা
শ্রী অরুণচন্দ্র দেববর্মা	পিতা— শ্রী ময়না দেববর্মা, গ্রাম— নাকাশি-পাড়া, সেলেমা, জেলা— ধলাই, ত্রিপুরা।
শ্রী সোনাকুমার ত্রিপুরা	পিতা—শ্রী মঙ্গলচন্দ্র ত্রিপুরা, পো— সাতচাঁন, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা।
শ্রী অবনীভূষণ চাকমা	পিতা— শ্রীসূর্যমোহন চাকমা, গ্রাম— উত্তর একছরি, পো— করবুক, দক্ষিণ ত্রিপুরা।
শ্রী অমূল্য ত্রিপুরা	পিতা— শ্রী মন্টুকুমার ত্রিপুরা, গ্রাম— জয়চন্দ্রপাড়া (দুর্গাছড়া), পোঃ ছৈলেংটা, জেলা— ধলাই, ত্রিপুরা।
শ্রী মেলাফু মগ	পিতা— শ্রী মানুভু মগ, গ্রাম— রতনমনি, পোঃ সাতচাঁন, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, ত্রিপুরা।
শ্রী ভগীরথ আসলং	পিতা— শ্রী শান্তিকুমার আসলং, গ্রাম— পশ্চিম ছামনু, পোঃ ছামনু, জেলা— ধলাই, ত্রিপুরা।
শ্রী পূর্বকুমার ত্রিপুরা	পিতা— শ্রী অশ্বিনীকুমার ত্রিপুরা, গ্রাম— সোনাইছড়ি, পোঃ ঋষ্যমুখ, বিলোনিয়া।
শ্রী কুশধ্বজ ত্রিপুরা	পিতা— শ্রী সুখরাজ ত্রিপুরা, গ্রাম— মোহিনীনগর, পোঃ ঋষ্যমুখ, বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ত্রিপুরা।
শ্রী সুখ দেববর্মা	পিতা— মৃত সূর্যদেববর্মা, গ্রাম— আমতলী, পোঃ বিশ্রামগঞ্জ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, ত্রিপুরা।
শ্রী আখ্য মগ	পিতা— অঞ্জরী মগ, গ্রাম— গরিফা, পোঃ রূপাইছড়ি, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, ত্রিপুরা।
শ্রী বিদ্যামোহন চাকমা	পিতা— শ্রী লক্ষ্মীরাম চাকমা, গ্রাম ও পোঃ শিলাছড়ি, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, ত্রিপুরা।
শ্রী অরুণ চাকমা	পিতা— শ্রী ধনঞ্জয় চাকমা, গ্রাম— গয়নামা, পোঃ মনু (উত্তর), জেলা— ধলাই। ত্রিপুরা।
শ্রী মঙ্গল দেববর্মা	পিতা— জ্ঞানচন্দ্র দেববর্মা, গ্রাম ও পোঃ চাঁচুবাজার, হেজামারা, মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা।

উপজাতি কবিরাজরা যে-সব রোগের চিকিৎসা করেন

১। বাত	১৫। আম
২। পেটব্যথা	১৬। খাজ
৩। মাথাব্যথা	১৭। দাঁদ
৪। পাতলা পায়খানা	১৮। গঁটি
৫। কাশি	১৯। অর্শ
৬। জন্ডিস	২০। ডায়া
৭। গ্যাসট্রিক	২১। হাঁপা
৮। রক্তপায়খানা	২২। ম্যা
৯। সূতিকা	২৩। পে
১০। অ্যাপেন্ডিসাইটিস	২৪। শিশু-
১১। কিডনি স্টোন	২৫। কুকু
১২। পেটের আলসার	২৬। রক্ত প
১৩। হাড় ভাঙা	২৭। বিষ
১৪। নিমোনিয়া	

○ বাসকল্লাই ○

(বাংলা— বাসক)

● **ব্যবহার ঃ** বাসকল্লাই যক্ষ্মারোগে খুব উপকারী। বাসক পাতার রস এবং গাছের ছালের রস নিংড়ে অথবা জলে সেদ্ধ করে খাওয়ালে যক্ষ্মারোগীর মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা বন্ধ হয়। বাসকল্লাই-এর পাতার রস মধুর সঙ্গে খেলে ছেলে বুড়ো সবার কাশি কমে যায়। আবার বাসকল্লাই-এর ছালের ক্বাথ বানিয়ে খেলে কৃমি কমে যায়। এ-ছাড়া গোচনার সঙ্গে বাসক পাতার রস মিশিয়ে খোস পাচড়ায় লাগালে তা ভালো হয়ে যায়।

● **পরিচিতি ঃ** বাসকল্লাই হল একান্থেসী (*Acanthaceae*) পরিবারের গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম হল আধাটোডা বাসিকা (*Adhatoda vasica*)। ইংরেজিতে বাসকল্লাইকে বলে আডুসা (Adusa) এবং হিন্দিতে বলে আডাসা, বাংলায় বাসকল্লাইকে বলে বাসক।

বাসকল্লাই হল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, দু-প্রকারের বালকল্লাই দেখা যায়, একটি কালো এবং অন্যটি সাদা (যেগুলি দিয়ে বাড়ি বা বাগানের বেড়া দেওয়া যায়)। গাছগুলি দুই থেকে তিন মিটার (৪ থেকে ৫ হাত) পর্যন্ত উঁচু হতে পারে সুন্দর ফুলের মঞ্জরিসহ। পাতাগুলি লম্বাটে এবং বল্লমের মতো একক পত্রযুক্ত। কাণ্ডে শিরা থাকে। ফুল বেগুনি দাগযুক্ত হয়, যা শীতকালে দেখা যায়। ফলে ছোটো সুপারীর মতো অনেক বীজ থাকে।

● **বংশবিস্তার ঃ** সাধারণত বাসকল্লাই অঙ্গজ জননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করা যায়। পুষ্ট ও নীরোগ বাসকল্লাই-এর কাণ্ড থেকে প্রায় তিন-চারটি গিঁট যুক্ত প্রায় ২৫ সেমি (আধ হাত) লম্বা কাটিং নেওয়া হয়। এককোণে নীচের দিকে তেরচা করে কাটা হয়, যাতে মাটিতে বেশি পরিমাণ লেগে যেতে পারে।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** বৃষ্টি শুরু হলেই বাসকল্লাই গাছ লাগানো যায়। প্রায় দু-তিনবার লাঙল দিয়ে কাঠা প্রতি প্রায় একটন গোবর সার মিশিয়ে দিতে হয়। এরপর জমি সমান করে প্রায় দু-মিটার (৪ হাত) দূরে দূরে লাইন করে প্রায় ৫০ সেমি (এক হাত) দূরে দূরে গর্ত করা হয়। গর্তগুলি প্রায় ২৫ সেমি (আধ হাত) ব্যাস ও গভীরতাযুক্ত হয়। গর্তের মাটি সমান করে মাঝমাঝে ডালের কাটিং লাগানো হয় তেরচা

ভাবে। বৃষ্টি না হলে জল দিতে হয়। মাঝে মাঝে ঘাসবাছাই করে দিতে হয়। কাটিং নষ্ট হয়ে গেলে আবার লাগানো হয়। প্রায় দুই বছরের গাছ থেকে পাতা তোলা যায় এবং প্রায় পাঁচ বছরের গাছের ছাল ও পাতা উভয়ই তোলা যায়। বছরে প্রায় ৮০০ কিলো ফসল প্রতি কাণিতে হয়।

○ কাখবুফাং ○
(বাংলা— কালমেঘ)

● **ব্যবহার ঃ** লিভারের যে-কোনো রোগে কাখবুফাং বা কালমেঘ খুব উপকারী। এর রস খেলে জন্ডিস রোগ দূরে রাখা যায়। কাখবুফাং -এর পাতার রস খেলে কৃমি নাশ হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা কমে যায়। এজন্য এটি অর্শ রোগেও উপকারী। পাতার রস আবার পাতলা পায়খানা এবং আমাশয়েও উপকারী। এ-ছাড়া সাধারণ দুর্বলতা এবং পেটের ব্যথার উপশম হয় কালমেঘের পাতা বা গাছের রস খেলে।

● **পরিচিতি ঃ** কাখবুফাং একান্থেসী (*Acanthaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল এন্ড্রোগ্রাফিস পেনিকুলেটা (*Andrographis paniculata*)। ইংরেজিতে একে বলে *crit* (ক্রিট) এবং হিন্দিতে বলে কিরায়ত। আর বাংলা নাম হল কালমেঘ।

চতুষ্কোণ কাণ্ডযুক্ত প্রায় এক মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। এটি বর্ষজীবী বীরুৎ। লম্বাটে— প্রায় আট দশ সেমি. লম্বা ও প্রায় তিন চার সেমি. প্রস্থ— পাতাগুলি সরল এবং দুদিকেই সরু হয়। গোড়া থেকে অনেক শাখা বের হয়ে উপরে অনেক প্রশাখা হয়ে গাছ ঝোপড়া হয়। ছোটো প্রায় বেগুনি ফুল থেকে লম্বাটে ক্যাপসুলের মতো ফলে বীজ হয় শীতকালে। ফাল্গুন-চৈত্রমাসে হালকা বাদামি বীজ সংগ্রহ করে বৃষ্টির শুরুতে লাগানো যায়।

● **বংশবিস্তার ঃ** বীজের মাধ্যমে কাখবুফাং এর বংশবিস্তার ভালো হয়। এ-ছাড়া অনেক গাছের প্রয়োজন বলে ছোটো ছোটো পুষ্ট বীজ কাণি প্রতি প্রায় ৫০ গ্রাম হলেই চলে। তবে গাছের শাখা থেকেও বংশ বিস্তার অথবা কাখবুফাং বা কালমেঘের চাষ করা যায়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** বীজতলা করে বেডের উপর লাইন করে (প্রায় ৬ আঙুল দূরে দূরে) পর পর তিন আঙুল দূরে দূরে বীজবপন করা

হয় বৃষ্টির শুরুতে। তারপর হালকা মাটি দিয়ে ঢেকে রাখলে এক সপ্তাহে চারা বের হয়। ১৫ দিন পর ঘাস বাছাই করে দিতে হয়। তিন বা চার সপ্তাহের চারা লাগানো যায়।

মূল জমিতে কাণি প্রতি ২টন গোবর বা জৈব সার দিয়ে লাঙলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। তারপর সমান করে প্রায় ৫০ সেমি (একহাত) দূরে দূরে লাইন করে প্রায় ২৫ সেমি (আধ হাত) দূরে দূরে চারা লাগানো হয়। এরপর বৃষ্টি না থাকলে জল দেওয়া হয়। প্রতি ১০ বা ১২ দিন পর পর ঘাস বাছাই করা হয়। তিন মাসের মধ্যে প্রথম ফসল উঠে শ্রাবণ-ভাদ্রে। এরপর আশ্বিন-কার্তিক মাসে আবার গাছ ও পাতা তোলা যায়। প্রতিবারে কাণি প্রতি প্রায় ৩০০ কিলো গাছ পাওয়া যায়।

○ চান্দুমা ○

(বাংলা— সর্পগন্ধা)

● **ব্যবহার ঃ** ব্লাড প্রেসার বা উচ্চরক্ত চাপে চান্দুমা খুব উপকারী। চান্দুমার শিকড়ে থাকে অনেক জাতীয় ক্ষারীয় পদার্থ যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। উন্মাদ রোগেও চান্দুমা বা সর্পগন্ধা উপকারী। চান্দুমার শিকড় বেটে খেলে জ্বর কমে যায়। এ-ছাড়া পেটের অসুখেও চান্দুমা ব্যবহৃত হয়।

● **পরিচিতি ঃ** চন্দুমা হল এপিসেনেসি (*Apiceneceae*) পরিবারযুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল রাউভলফিয়া সার্পেন্টিনা (*Rauwolfia serpentina*)। ইংরেজি রাউভলফিয়া (Rauwolfia) এবং হিন্দী নাম হল ছোটাচান্দ। চান্দুমাকে বাংলায় বলা হয় সর্পগন্ধা।

গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ হল চান্দুমা। প্রায় ৭৫ সেমি থেকে ১মিটার (দেড় থেকে দু হাত) লম্বা হয় এবং ঝোপের মতো হয়। কাণ্ডের পর্বে কয়েকটি সরল পাতা একত্রে চক্রাকারে থাকে। পাতা শীতে ঝরে যায়। লম্বাটে পাতা প্রায় ১০ থেকে ২০ সেমি হয় এবং সামনে পেছনে সরু হয়। ছোটো ছোটো গুচ্ছে ফুল ফোটে সেগুলি হয় প্রায় দেড় দু সেমি লম্বা ও হালকা গোলাপি রং-এর। তবে ফুলের বৃন্তগুলির রং হয় গাঢ় লাল। ঘন কালচে রং-এর ছোটো গোলাকার ফুল হয়।

● **বংশবিস্তার ঃ** চন্দুমা বা সর্পগন্ধার বংশবিস্তার বীজ এবং কাটিং-

● **পরিচিতি ঃ** তুলসীকসম হল ল্যামিয়েসি (*Lamiaceae*) পরিবারভুক্ত গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম হল অসিমাম স্যাংটাম (*Occimum sanctum*)। ইংরেজিতে একে বলে সেক্রেড বাসিল (*Sacred basil*)। হিন্দিতে এবং বাংলায় বলে তুলসী।

তুলসীকসম বীরুৎ জাতীয় বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। প্রায় ৫০ সেমি থেকে ১ মিটার (দু'হাত) পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। লম্বাটে খাঁজকাটা পাতার অগ্রভাগ সরু হয় এবং পাতার মধ্যে ছোটো ছোটো লোম থাকে। হালকা বেগুনি আভাযুক্ত পুষ্পমঞ্জরি গোঁজা থাকে এবং অগ্রভাগ ক্রমশ সরু হয় এবং গন্ধ ছড়ায়। ছোটো ছোটো ফলে লালচে হলুদ বীজ হয় এবং বীজ মাটিতে পড়ে নতুন চারা-গাছ জন্মায়।

● **বংশবিস্তার ঃ** তুলসীকসমের বংশবিস্তার হয় বীজের মাধ্যমে। পুরানো গাছের নীচে ছোটো ছোটো চারা পাওয়া গেলেও বীজতলায় অনেক চারা এক সঙ্গে তৈরি করে নেওয়া ভালো। তারপর সবল চারা মূল জমিতে গর্ত করে লাগানো যায়। পরিপক্ক পুষ্পমুঞ্জরির নীচে ব্যাগ বা গামছা ধরে কাঁচি দিয়ে মঞ্জরি কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে বীজ রাখা যায় শুকনো দিনে।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** বৃষ্টির সাথে সাথে এক মিটার (দু হাত) পাশ মাঝখানে উঁচু বীজতলা বানিয়ে প্রায় তিন চার আঙুল (প্রায় ছয় সাত সেমি) দূরে দূরে লাইন করে পর পর বীজ বপন করা হয়। বৃষ্টি না থাকলে অল্প অল্প করে জল দিতে হয় ও ঘাস বাছাই করতে হয়। বীজ হালকা বলে সেগুলির উপর সব সময় ঝুরঝুরে মাটি ছড়িয়ে ঢেকে রাখা হয়। এক কাণির (বিঘা) জন্য প্রায় ১৫০ গ্রাম বীজের দরকার হয়।

মূল জমিতে লাঙলের সঙ্গে কাণি প্রতি প্রায় একটন গোবর বা জৈব সার মিশিয়ে জমি সমান করা হয়। এরপর প্রায় ৫০ সেমি (১ হাত) দূরে দূরে লাইন করে বর্গাকার হিসাবে দু-তিন সপ্তাহের চারা লাগানো হয়। বৃষ্টি না থাকলে জলসেচ দিতে হয়। প্রায় দশ বারো দিন পরপর ঘাশ বাছাই করে গাছের গোড়ার মাটি তুলে দিতে হয়। চারা মরে গেলে নতুন চারা রোপণ করা হয়। গাছ বড়ো হয়ে ঢলে পড়লে তাতে খুঁটি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। বর্ষার সময় জল নিকাশী নালা করে দিতে হয়। আবার শীতে জলসেচ দিতে হয়। চারা রোপণের দু-তিন মাস পর থেকেই পাতা তোলা যায়। তবে নীচের বড়ো পাতা প্রথম তোলা উচিত। বছরে কাণি প্রতি প্রায় ৫০ কিলো পাতা, ১৫ কিলো বীজ এবং প্রায় ২৫০ কিলো শিকড় পাওয়া যায়।

○ পিপুই ○

(বাংলা— পিপুল)

● **ব্যবহার ঃ** পিপুই বা পিপুলের গুঁড়ো শোথ রোগে উপকারী। কাঁচা ফল এবং শিকড় পিষে ক্বাথ বানিয়ে খেলে কাশি ও ব্রঙ্কাইটিস কমে যায়। স্মৃতিশক্তি বাড়াতে পিপুই বা পিপুল চূর্ণ করে খেলে উপকার পাওয়া যায়। এ-ছাড়া পিপুই বা পিপুলের টনিক খুব পুষ্টিকর এবং বলদায়ক। চর্মরোগে এবং অর্শে স্থানীয়ভাবে পিপুই-এর পেস্ট লাগালে সেগুলি কমে যায়। পিপুই এ থাকে শতকরা প্রায় ২ ভাগ পিপারিনেল। এ-ছাড়া থাকে রেসীন, উদ্বায়ী তেল, স্টার্চ, অ্যালকালয়েড ইত্যাদি।

● **পরিচিতি ঃ** পিপুই হল পিপারেসি (*Piperaceae*) পরিবারযুক্ত। বৈজ্ঞানিক নাম হল পীপার লঙ্গাম (*Piper longum*)। ইংরেজি নাম হল ইন্ডিয়ান লং পিপার (*Indian long pipper*)। এবং হিন্দি নাম হল পীপল বা পিপলি। পিপুই-এর বাংলা নাম হল পিপুল।

পিপুই গাছ লতানো কাণ্ডযুক্ত যা মাটিতে লতিয়ে চলে, আবার বাউনির মাধ্যমে উপরে ওঠে। এজন্য অন্য গাছের বাগানে চাষ করা ভালো। প্রায় আট দশ সেমি লম্বাটে হৃদপিণ্ডাকৃতি পাতাগুলি রসালো হয়। সঙ্গে ছোটো ছোটো উপপত্র থাকে। পুরুষ ফুল (সরু) এবং স্ত্রীফুল (মোটা) আলাদা হয়। ডিম্বাকৃতি ফল হয়। প্রায় পান পাতার মতো (সরু অগ্রভাগ ছাড়া) পাতাগুলির বোটার দিকে কাটা থাকে।

● **বংশবিস্তার ঃ** কাটিং বা বীজের মাধ্যমে পিপুই বা পিপুল বংশবিস্তার করে। পানের মতো তিন-চারটি পর্বযুক্ত কাণ্ডের অংশ মাটিতে পুঁতে চারা তৈরি করা যায়। অথবা বীজতলায় বীজ বুনে চারা তৈরি করা যায়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** বৃষ্টির সময়ে পাঁচ-ছয় বার চাষ দিয়ে তার সঙ্গে কাণি প্রতি প্রায় দু-টন জৈব বা গোবর সার মিশিয়ে দিতে হয়। তারপর সমস্ত জমি সমান করে নেওয়া হয়। এরপর প্রায় একহাত (৫০ সেমি) দূরে দূরে চারা লাগিয়ে হালকা জলসেচ দেওয়া হয়। প্রতি কাণিতে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার চারার দরকার হয়। এরপর প্রতি পক্ষকাল অন্তত একবার ঘাস বাছাই করতে হয়। প্রায় এক দেড়মাস সময় থেকে কাঠি পুঁতে বাউনির সঙ্গে বেঁধে দিতে হয়। শীতকালে জলসেচ দিতে হয় গাছের গোড়ায় নালি করে। প্রায় সাত-আট মাস পর থেকে শীষ (ছড়া) বের হয় এবং তার দু-তিন মাস পর পক্ক ছড়া কাটা হয়। তিন বছরের

গাছের শিকড়, শীষ এবং ফল সব আলাদা করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। বছরে প্রতি কাণিতে প্রায় ১০০ কিলো শীষ ও ফল এবং প্রতি তিন বছরে প্রায় ১০০ কিলো শিকড় উৎপন্ন হয়।

○ শতমূলী ○

(বাংলা— শতমূলী)

● **ব্যবহার ঃ** মায়েদের দুধের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য শতমূলীর রস দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে উপকার হয়। প্রোস্টেটের গণ্ডগোলে বা প্রস্রাব করতে কষ্ট হলে সকাল বিকাল শতমূলী চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে প্রস্রাব স্বাভাবিক হয়। ফাইলেরিয়া (গোদা পা) রোগে শতমূলীর রস উপকারী। এ-ছাড়া স্বরভঙ্গ রোগেও শতমূলীর গুঁড়ো জলে গুলে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

● **পরিচিতি ঃ** শতমূলী হল লিলিএসি (*Liliaceae*) পরিবারভুক্ত। বৈজ্ঞানিক নাম হল এসপারাগাস রেসিমৌসাস (*Asparagas racimosus*)। এবং ইংরেজি নাম হল এসপারাগাস (*Asparagas*) এবং হিন্দি নাম হল রোজ হিদান।

শতমূলী গাছগুলি লতানো এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত সেগুলির সাহায্যে বিভিন্ন বড়ো বড়ো গাছে বেড়ে ওঠে। পাতা সরু এবং লম্বাটে এবং লতায় কাঁটা থাকে যেগুলি আবার বাঁকা হয়। শরৎকালে ফুল হয়ে বসন্তকালে খুব সুগন্ধযুক্ত ফল পেকে উঠে। শতমূলী গাছের শিকড়গুলি মাংসল হয়। মনে হয় যেন একশত সরু মাংসল শিকার একসঙ্গে আছে। এজন্য এর নাম হয়েছে শতমূলী।

● **বংশবিস্তার ঃ** শতমূলীর বংশবিস্তার হয় বীজের মাধ্যমে। তবে শিকড়ের সাহায্যেও বংশবৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু তাতে অনেক বীজ পাওয়া কঠিন হবে। এজন্য বীজতলাতে বীজ বপন করে চারা তৈরি করে নিতে হয়। এক কাণিতে চাষ করলে প্রায় দেড় হাজার চারা দরকার হয়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** জল দাঁড়ায় না এমন বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে। বর্ষাকালে টিলাজমিতে লাগানো যায়। মূল জমিতে প্রায় এক মিটার দূরত্বে (১ মি × ১মি) প্রায় ২৫ সেমি বা আধ হাত ব্যাস ও গভীরতাযুক্ত গর্ত করতে হয়। তার মাটির সঙ্গে

প্রায় দু-কিলো গোবর বা জৈবসার ভালো করে মিশিয়ে মাটি সমান করা হয়। এরপর গর্তের মাঝামাঝি প্রায় ১৫ সেমি লম্বাটে চারা লাগানো হয়। মাঝে মাঝে ঘাস বাছাই করে দিতে হয়। প্রায় দেড় দুমাস বয়সে শক্ত কাঠি দিয়ে বাউনিতে বেঁধে দিতে হয় যাতে বড়ো গাছে চড়তে পারে। বহুবর্ষজীবী শতমূলী গাছ থেকে তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে সরুসরু আলু তোলা ভালো কারণ তাতে কাণিতে প্রায় দু-তিন টন আলু (সরু শাঁসালো শিকড়) পাওয়া যায়।

○ স্যামছোটা ○

(বাংলা— থানকুনি)

● **ব্যবহার ঃ** আমাশয়ে স্যামছোটা বা থানকুনি পাতার রস খুবই উপকারী। রক্তদোষে স্যামছোটা বা থানকুনি গাছ বেটে খেলে রক্ত পরিষ্কার হয়। দুধের সঙ্গে স্যামছোটা বা থাণকুনির পাতার রস গরম করে খাওয়া হয় অবসাদ দূর করতে এবং পেট খারাপ হলে। স্যামছোটা পাতা বেটে মলম বানিয়ে সিফিলিস এবং কুষ্ঠ রোগের ক্ষতে ব্যবহার করা হয়। থানকুনি বা স্যামছোটা পাতার রস খেলে চুল পড়া কমে যায়।

● **পরিচিতি ঃ** স্যামছোটা বা থানকুনির পরিবার হল এপিএসি (*Apiaceae*)। বৈজ্ঞানিক নাম হল সেন্টেলা এসিয়াটিকা (*Centella asiatica*)। ইংরেজিতে একে বলা হয় ইন্ডিয়ান পেনিওয়ার্ট (*Indian Peniwart*) বা সেন্টেলা (*Centella*)। হিন্দিতে একে বলে ব্রহ্মাণ্ডুকি। বাংলায় স্যামছোটাকে থানকুনি বা আদামনী বা টাকামনীও বলা হয়।

নরম লতানো কাণ্ডযুক্ত গাছ মাটিতে লতিয়ে চলে। যাওয়ার সময় প্রতি থেকে শিকড় ছড়ায় মাটিতে। কাণ্ডের পর্বে লম্বাটে সরু বোঁটার মধ্যে ২ থেকে ৪ সেমি ব্যাসযুক্ত প্রায় গোলাকার টাকার মতো পাতলা পাতা হয়। তবে পাতার কিনারগুলি অল্প আঁকাবাঁকা এবং বোটার কিনারে খাঁজ থাকে। উজ্জ্বল লাল ফুল থেকে অনেক বীজযুক্ত ফল হয়।

● **বংশবিস্তার ঃ** থানকুনি বা স্যামছোটার সরু ধাবিত লতার মাধ্যমে বংশবিস্তার হয়। লতানো কাণ্ডের গিঁটে যে শেকড় বের হয় তা কাণ্ডসুদ্ধ কেটে মাটিতে লাগানো যায়। এ-ছাড়া বীজের মাধ্যমেও স্যামছোটার বংশবিস্তার করা যেতে পারে তবে তাতে গাছের বৃদ্ধি দেরিতে হয়। এজন্য সুস্থ সবল গাছের শিকড়যুক্ত পর্বসহ কাটিং দিয়ে বংশ বিস্তার করে চাষ করা ভালো।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** ছায়াঘেরা অথবা স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে স্যামছোটা বা থানকুনি ভালো জন্মে। তবে অতিরিক্ত জল দাঁড়ানো জমি ভালো নয়। বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটিতে চাষ করা যায়। দু-তিন বার জমিতে লাঙল দিয়ে তার সঙ্গে কাণি প্রতি প্রায় দুশো কিলোগ্রাম গোবর বা জৈবসার মিশিয়ে জমি সমান করা হয়। তারপর প্রায় আধ বা ২৫ সেমি দূরে দূরে লাইন রেখে প্রায় ১৫ সেমি দূরে দূরে চারা লাগানো হয়। চারার জায়গা সমান করে তাতে দুই সেমি ব্যাসের প্রায় চার সেমি গভীরতা যুক্ত গর্তে চারা লাগানো হয়। বৃষ্টি না থাকলে জল দেওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে একবার অন্তত ঘাস বাছাই করে দিতে হয়, যাতে অন্য ঘাস না মিশে যায়। জমিতে ছায়া পরিবেশ তৈরির জন দক্ষিণ দিকে অন্য গাছ থাকা ভালো। শীতকালে অল্প অল্প করে বার বার জলসেচ দিতে হয়। চারা রোপণের দু-তিন মাস পর থেকেই পাতা তোলা যায়।

স্যামছোটা বা থানকুনি পাতা বছরে প্রায় সাত আট বার তোলা যায়। এটি বহুবর্ষজীবী বলে প্রায় চার-পাঁচ বছর ফসল পাওয়া যায় একই জমি থেকে। প্রতি বছর প্রতি কাণি থেকে প্রায় ৩০০ কিলোগ্রাম পাতা পাওয়া যায়।

○ নালজোড়া ○

(বাংলা— হাড়জোড়া)

● **ব্যবহার ঃ** শরীরে যে-কোনো জায়গায় হাড় অল্প পরিমাণ ভাঙলে বা মচ্‌কে গেলে নালজোড়া গাছের কাণ্ড বেটে পেস্ট বানিয়ে ভাঙা জায়গায় প্রলেপ দেওয়া হয় কিছুদিন ধরে। তাতে মচকে যাওয়া বা অল্প ভেঙে যাওয়া হাড় জুড়ে যায়। এ-ছাড়া নালজোড়া গাছের কাণ্ডের খোসা মাসকলাইয়ের সঙ্গে পিষে পেটের বায়ু এবং অরুচি রোগে খেলে উপকার পাওয়া যায়। গুঁড়ো কৃমি হলে নালজোড়া গুঁড়ো করে ঘিয়ে ভেজে খেলে কৃমি কমে যায়। অম্বলের দোষ থাকলে নালজোড়ার কচি পাতা এবং কাণ্ড গুঁড়ো করে ঠান্ডা জলের সঙ্গে খেলে উপকার হয়। হাড়জোড়া গাছে প্রোটিন থাকে ১২.৫%, চর্বি থাকে প্রায় ১১%, কার্বহাইড্রেট প্রায় ৩৫%। এ-ছাড়া ভালো পরিমাণে থাকে ক্যালশিয়াম, ফসফরাস, পটাশ এবং ম্যাগনেশয়াম ইত্যাদি।

● **পরিচিতি ঃ** নালজোড়া গাছ ভাইটেসি পরিবার (*Vitaceae*) জাতীয় গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম হল সাইগাস কোয়াড্রেঙ্গু লারিস (*Cissus quadrangulasis*)। ইংরেজিতে একে বলা হয় বোন সেটার (*Bone*

setter) এবং হিন্দিতে বলা হয় হাড় জুরি। ককবরকে নালজোড়াকে মুখরা লাথাও (*Mukhra latha*) বলা হয়ে থাকে।

গাছগুলি বহুবর্ষজীবী, চতুষ্কোণাকার রসালো কাণ্ডগুলি জোড়া জোড়া দেখতে হয় কারণ পর্বগুলি খুব শঙ্কুচিত হয়। মনে হয় প্রায় ১০ থেকে ১২ সেমি লম্বা টুকরোগুলি জোড়া দিয়ে গাছ তৈরি হয়েছে। পর্বের মধ্যে ছোটো ছোটো রসালো পাতা হয় এবং আকর্ষ থাকে। সুতোর মতো আকর্ষ দিয়ে গাছগুলি অবলম্বনে জড়িয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করে। পাতাগুলি প্রায় ২ থেকে ৪ সেমি লম্বাটে হয় এবং দেখতে হৃদপিণ্ডকার এবং পাতায় খাঁজ কাটা থাকে। চৈত্রমাসে সাদা ফুল ফোটে এবং ফলগুলি পাকলে লাল এবং মটরদানার মতো বড়ো হয়।

● **বংশবিস্তার ঃ** নালজোড়া গাছ কাণ্ডের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে। এজন্য প্রায় দুটি পর্বযুক্ত কাণ্ডের কাটিং ছোটো ছোটো করে কেটে বৃষ্টির সময় লাগানো যায়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** ভালো জলনিষ্কাশনযুক্ত জমিতে তিন চারবার চাষ করে তার সঙ্গে প্রায় একটন গোবর বা জৈব সার মিশিয়ে নেওয়া হয়। তারপর প্রায় একমিটার দূরে দূরে এবং প্রায় ৫০ সেমি বা অর্ধ মিটার দূরে দূরে প্রায় ১৫ সেমি ব্যাসযুক্ত ও গভীরতাযুক্ত গর্ত করা হয়। গর্তের মাটি ভালো করে ঝুর ঝুরে করে সমান করে মাঝখানে প্রায় দু-তিন সেমি গর্ত করে শিকড় ঢুকিয়ে দুদিক থেকে মাটি চেপে দেওয়া হয়। পরে অল্প জল দিয়ে পাতা বা কলার খোল দিয়ে ছায়া দিতে হয়।

মাঝে মাঝে ঘাস বেছে দিতে হয় এবং গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হয়। প্রায় দেড় মাস বয়সে গোড়ায় কাঠি বা শক্ত বাউনির ব্যবস্থা করতে হয়। শীতকালে গোড়ার চারদিকে নালি করে জল দিতে হয়। বাড়ির বেড়া বা গাছের পাশে লাগালে ভালো কারণ গাছগুলি বহুবর্ষজীবী। এক বছর বয়সের গাছ থেকেই পাতা এবং কাণ্ড ঔষধের জন্য ব্যবহার করা যায়। বছরে কাণি প্রতি প্রায় ৫০০ কিলোগ্রাম কাণ্ড এবং পাতা পাওয়া যায়।

○ উসোন্‌দুই ○

(বাংলা— পুদিনা)

● **ব্যবহার ঃ** উসোনদুই অনেক কাজে লাগে। উসোনদুই বেটে নুন দিয়ে খেলে অরুচি দূর হয় এবং খিদে বাড়ে অর্থাৎ এপেটাইজারের (স্যুপের) কাজ করে। উসোনদুই অম্ল পিত্তে বা পেটে অ্যাসিড হলে

ভালো কাজ করে। নুন জলের সঙ্গে উসোনদুই খেলে সর্দি কাশি কমে। পেটের রোগীরা উসোনদুই-এর শাক্ খেতে পারেন অল্প পরিমাণে। বমি বমি ভাবে উসোনদুই-এর পাতা খেলে বা শুঁকলে বমি হয় না।

● **পরিচিতি ঃ** উসোনদুই হল লেবিয়েসী (*Labiaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল মেন্থা আর্ভেনসিস (*Mentha arvensis*)। এর ইংরেজি নাম হল ফিল্ড মিন্ট (*Field mint*) উসোনদুই-এর হিন্দি নাম হল পোদিনা এবং বাংলা নাম হল পুদিনা।

● **বংশবিস্তার ঃ** উসোনদুই সাধারণত অঙ্গজ জননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। লতানো কাণ্ডের গিঁটে শিকড় হয়। এই শিকড়যুক্ত তিন-চারটি পর্বসহ কাণ্ডের কাটিং লাগিয়ে উসোনদুই চাষ করা যায়। একটি কাটিং প্রায় ৮ থেকে ১০ সেমি (প্রায় পাঁচ আঙুল) লম্বা এবং অন্তত এক বছরের পুরোনো হওয়া দরকার হয়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** উসোনদুই বা পুদিনা চাষের জন্য বৃষ্টির প্রারম্ভে জমিতে লাঙল দেওয়ার সময় কাণি প্রতি প্রায় তিন টন গোবর বা জৈব সার মিশিয়ে জমি সমান করা হয়। এরপর প্রায় ৫০ সেমি (এক হাত) দূরে দূরে লাইন করে প্রায় ২৫ সেমি (আধ হাত) পরে পরে চারা রোপণ করা হয়। প্রতি কাণিতে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার চারা রোপণ করা যায়। এরপর চারাগুলিতে জল দেওয়া হয় যদি বৃষ্টি না থাকে। প্রায় ১৫ দিন পর পর ঘাস বাছাই করে গোড়ার মাটি তুলে আলের মতো করা হয়। টিলা জমিতে আল জমির ঢালের বিপরীতে হয়। কাটিং মরে গেলে নতুন কাটিং লাগানো হয়। শুকনো দিনে মাঝখানের নালাতে জল সেচ দিতে হয়। সুবিধা থাকলে এই জলসেচের আগে নালিতে খইলের জল দেওয়া ভালো অথবা গোয়ালঘর ধোয়া জলও দেওয়া যায়।

কাটিং-এর চারা লাগানোর তিন চার মাস পর থেকে পাতা তুলে শাক হিসাবে বিক্রি করা যায়। এর পর বৃষ্টির দিনে প্রতি মাসে ও শীতে ৪০ দিন পরপর পাতা তোলা যায়। বহুবর্ষজীবী উসোনদুই বা পুদিনার পাতা প্রতি বছর প্রায় তিন টন ফলন হিসাবে পাওয়া যায় প্রতি কাণি থেকে।

○ ঘৃতকাঞ্চন ○

(বাংলা—ঘৃতকুমারী)

● **ব্যবহার ঃ** ঘৃতকাঞ্চন গাছের পাতার রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে পায়খানা পরিষ্কার হয়। পাতার রস সেবনে মায়েদের মাসিক

পরিষ্কার হয়। পুড়ে বা কেটে ক্ষত হলে এবং একজিমায় পাতার শাঁস লাগালে সেগুলি ভালো হয়ে যায়। ঘৃতকুমারী পাতার রস অর্শ রোগের উপশম ঘটায়। এ-ছাড়া ঘৃতকাঞ্চন পাতার রস খেলে মায়েদের সাদা স্রাব কমে যায়।

● **পরিচিতি ঃ** ঘৃতকুমারী হল লিলিয়েসি (*Liliaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল এলয় বার্বাডেন্সিস (*Aloi barbadensis*)। ঘৃতকুমারী ইংরেজি নাম হল এলয় (*Aloi*)। এর হিন্দি নাম হল ঘৃকনভার এবং বাংলায় ঘৃতকুমারী।

বহুবর্ষজীবী নরম কাণ্ডযুক্ত বীরুৎ জাতীয় গাছ যেগুলি প্রায় ৫০ সেমি (এক হাত) পর্যন্ত হয়। ছোটো কাণ্ডের চারদিকে গুচ্ছের মতো পাতা থাকে। পাতাগুলির বোঁটা থাকে না, গোড়ায় কাণ্ডকে জড়িয়ে থাকে। ছোটো ছোটো তরোয়ালের মতো পাতাগুলির সম্মুখভাগ ছুঁচলো হয় এবং কিনারে কাঁটা থাকে। এ-ছাড়া পাতাগুলি পুরু ও শাঁসালো হয়। পাতার ভিতরের পুঁরু শাঁস লালার মতো পিচ্ছিল হয় এবং পাতার রং সবুজ। সরু পুষ্পদণ্ডে অনেক প্রায় হালকা সবুজ রং-এর ফুল হয় এবং বসন্তকালে ফল হয়।

● **বংশবিস্তার ঃ** ঘৃতকাঞ্চনের বংশবিস্তার সাধারণত করা হয় গোড়ায় গজিয়ে ওঠা তেউর দিয়ে। এই তেউর বা সাকার মূল জমিতে লাগিয়ে চাষ করা যায় বর্ষার সময়, বিশেষ করে আষাঢ় বা শ্রাবণমাসে।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** বেলে-দোআঁশ থেকে আরম্ভ করে এঁটেল দোআঁশ মাটিযুক্ত যে-কোনো টিলা বা পতিত জমিতেই ঘৃতকাঞ্চন চাষ করা যায়। মূল জমিতে তিন চারবার লাঙল চালিয়ে তার সঙ্গে কাণি প্রতি প্রায় একটন গোবর বা জৈব সার মিশিয়ে জমি সমান করা হয়। এর পর প্রায় ৫০ সেমি (এক হাত) দূরে দূরে লাইন করে বর্গাকারে তৈউর লাগানো হয়। বৃষ্টি না থাকলে অল্প অল্প জল দিতে হয় গোড়ায়। তার পর প্রতি ১৫ দিন অন্তর ঘাস বাছাই করি দিতে হয়। শীতকালে দু-তিন সপ্তাহ অন্তর সেচ দিতে হয় এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হয়। প্রায় দু-বছর পর থেকে পাতা তোলা যায় প্রতি বছর শরৎকালে। এ-ছাড়া বসন্তকালে ফুল সংগ্রহ করা যায়। প্রতি বছর প্রতি কাণিতে প্রায় ১০০ কিলোগ্রাম পাতার শাঁস এবং প্রায় ৩০ কিলোগ্রাম ফুল পাওয়া যায়।

○ বচ ○

(বাংলা—বচ)

● **ব্যবহার ঃ** খিদে বাড়ানোর জন্য বচের জুড়ি নেই। মূল এবং

পাতা দ্বারা সুগন্ধী পানীয় তৈরি হয় বচ থেকে। এই পানীয় খিদে বাড়ায় এবং এপেটাইজারের কাজ করে। পেট ফাঁপলে বা পেট ভার ভার মনে হলে বচের কন্দের চাঁড়া খেলে তা দূর হয়ে যায়। বচের কন্দের গুঁড়ো মিশিয়ে জল খেলে শ্বাসনালি শক্ত হয় এবং হাঁপানির কষ্ট কমায়। এ-ছাড়া বচ পাতার রস বা কন্দের গুঁড়ো খেলে আমাশয় নিরাময় হয়।

● **পরিচিতি ঃ** বচ হল এরেসি (*Araceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম হল আকরূম কেলামুস (*Achroom calamus*)। ইংরেজিতে বচকে বলে কেলামুস (*Calamus*)। হিন্দিতে বচকে বলে সফেদ বচ বা ঘোড়া বচ এবং বাংলায় বচই বলে।

বচ হল বহুবর্ষজীবী বীরুৎশ্রেণির উদ্ভিদ। সুগন্ধযুক্ত কাণ্ড নানা ভাগে বিভক্ত থাকে এবং মাটিতে ছড়িয়ে থাকে। লম্বা লম্বা পাতা হয় কেয়াফুলের পাতার মতো যেগুলি প্রায় এক থেকে দেড় মিটার (দু থেকে সাড়ে তিন হাত)। কিন্তু পাতার চওড়া মাত্র ৫ বা ৬ সেমি হয় তবে কিনারগুলি ঢেউ খেলানো হয়। কলার মোচার মতো স্পেডিক্স জাতীয় পুষ্পমঞ্জরী হয় এবং হলদে রং-এর ফল হয়।

● **বংশবিস্তার ঃ** বচের বংশবিস্তার হয় প্রধানত মূল দ্বারা। এ-ছাড়া গাছের গোড়ায় যে তেউর বের হয় তা দিয়েও বংশ বিস্তার করা যায়। চাষের জন্য বচের তেউর বেশি ব্যবহৃত হয় যেগুলি মূল জমিতে সরাসরি লাগিয়ে চাষ করা যায়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** বচ চাষের জন্য দরকার হয় স্যাঁতস্যেঁতে জায়গা। এজন্য ছায়াঘন জলনিষ্কাশনের অব্যবস্থাযুক্ত স্থানের নরম স্যাঁতস্যেঁতে কাঁদামাটিতে বচ চাষ করা হয়। জমির আগাছা পরিষ্কার করে প্রায় ৭৫ সেমি (প্রায় দেড় হাত) দূরত্বে বর্গাকারে লাগানো হয় প্রায় ২৫ সেমি (আধ হাত) ব্যাস ও গভীরতাযুক্ত গর্তে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে। এর পর মাসে মাসে ঘাস বাছাই করে দিতে হয়। মাটি শুকিয়ে গেলে সেচ দিয়ে মাটি নরম ও স্যাঁতসেঁতে কাদামাটিতে বচ চাষ করা হয়। লাগানো জমির মাটি শুকিয়ে গেলে সেচ দিয়ে মাটি নরম ও স্যাঁতসেঁতে রাখতে হয়। বচ গাছ থেকে কন্দমূল তুলে পরিষ্কার করে শুকিয়ে রাখা হয় ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতি কাণিতে প্রায় চার থেকে পাঁচশত কিলোগ্রাম কন্দমূল পাওয়া যায়।

○ বাখলা ○

(বাংলা—হরিতকী)

● **ব্যবহার ঃ** ব্রণে বা ফোঁড়ায় বাখলা ঘষে লাগালে তা কমে যায়। বাখলা ফল এবং গাছের বাকল দিয়ে টনিক বানিয়ে তা রক্তচাপ প্রশমনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ত্রিফলার মধ্যে বহেড়া এবং আমলকির সঙ্গে বাখলাও একটি। গরমজলের সঙ্গে বাখলার গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে দাস্ত পরিষ্কার হয়। বাখলার গুঁড়ো মিশিয়ে ধূমপানের মতো করলে হাঁপানির উপশম হয়। জ্বরে, পিত্তে, কফে এবং কটি বাতে বাখলা উপকারী। এ-ছাড়া বাখলা বা হরিতকী অর্শ এবং প্লীহা ও যকৃতজনিত কষ্টে উপশম দেয়।

● **পরিচিতি ঃ** বাখলা হল কমব্রিটেসী (*Combretaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম হল টারমনেলিয়া ছেবুলা (*Termanalia chebula*)। ইংরেজি নাম হল ছেব্‌লিক মাইরোবলেন (*Cheblic Mirobalan*)। বাখলার হিন্দি নাম হল হরদ এবং বাংলা নাম হল হরিতকী।

বাখলা বা হরিতকী হল বহুবর্ষজীবী শক্ত কাঠযুক্ত বৃক্ষ, যা প্রায় ৩০ মিটার (৬০ হাত) পর্যন্ত উঁচু হয় এবং অনেক শাখাপ্রশাখা থাকে। গাছের বাকল ধূসর রং-এর হয়। বড়ো বড়ো পাতাগুলি শীতে ঝরে যায়। বৃষ্টির শুরুতে নরম, উজ্জ্বলপাতা দেখা যায়। ফুলগুলি বাদামি বর্ণের হয় এবং ফলগুলি হয় লম্বাটে ডিম্বাকার যাতে পাঁচটি খাঁজ থাকে যা শীতের প্রারম্ভে পাওয়া যায়।

● **বংশবিস্তার ঃ** বাখলা বা হরিতকীর বংশবিস্তার হয় প্রধানত বীজ থেকে। বীজগুলি শক্ত বলে প্রথম বীজ তলায় বাখলার বীজ পুঁতে চারা তৈরি করা হায়। পরে বর্ষাকালের শেষে মূলজমিতে চারা লাগানো যায়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** যে-কোনো পতিত টিলা বা বনাঞ্চলে জলনিষ্কাশনযুক্ত জমিতে বাখলা বা হরিতকী চাষ করা যায়। প্রায় ৮ মিটার (১৬ হাত) দূরে দূরে প্রায় ৭৫ সেমি. (দেড় হাত) ব্যাস এবং গভীরতাযুক্ত গর্ত করে তাতে প্রায় দশ কিলোগ্রাম উত্তম পচা গোবর বা জৈব সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে তার মধ্যে প্রায় ছয় সাত মাস বয়সের চারা লাগানো হয়। মাঝে মাঝে ঘাস বাছাই করে গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া হয়। শুকনা সময়ে গোড়ায় জল দিতে হয় দু-তিন বছর পর্যন্ত যতক্ষণ না শিকড় মাটির গভীরে যায়। প্রায় যষ্ঠ বছর থেকে প্রতি বছর প্রতি গাছ থেকে প্রায় ৫০ কিলোগ্রাম বাখলা বা হরিতকী পাওয়া যায়।

○ থা বলং বা থাদুক ○

(বাংলা—খাম আলু)

● **ব্যবহার ঃ** থা বলং বা থাদুকে থাকে প্রচুর পরিমাণ ডায়োসজেনিন্ নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এই ডায়োসজেনিন্ থেকে তৈরি হয় গর্ভনিরোধক বড়ি যেগুলি জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়। থা বংল বা খাম আলু শোথ এবং প্রমেহনাশক। এ-ছাড়া কফ এবং পিত্তরোগের ঔষধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয় থা বলং বা খাম আলু। এগুলি আজকাল বিদেশে রপ্তানি করেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়।

● **পরিচিতি ঃ** থা বলং বা খাম আলু হল ডায়োস্কোরেসি (*Dioscoraceace*)পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল ডায়োস্কোরিয়া ফ্লোরিবান্ডা (*Diascorea floribanda*)। এর ইংরেজি নাম হল ইয়াম (*Yam*)। থা বলং এর হিন্দি নাম হল পিটালু এবং বাংলা নাম হল খাম আলু।

থা বলং লতা জাতীয় উদ্ভিদ যা বিভিন্ন গাছে বা অবলম্বনে বেয়ে ওঠে। প্রশস্ত ছোটো পাতা সরল এবং শক্ত ফলকে শিরাগুলি স্পষ্টভাবে থাকে। কাণ্ডের গায়ে বায়বীয় মূল থাকে এবং মাটির নীচে মাংসল লম্বা লম্বা অনেক কন্দ হয়। কন্দগুলি বাদামি রং-এর হয় এবং ভেতরটা হলদেটে শাঁসালো হয়।

● **বংশবিস্তার ঃ** থা বলং বা খাম আলুর বংশবিস্তার করা হয় সাধারণত বীজকন্দ দিয়ে।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** প্রতি কাণিতে প্রায় দুই টন গোবর বা আবর্জনা পচা সার মিশিয়ে নেওয়া হয়। চার পাঁচবার লাঙল চালিয়ে মাটি সমান করে তাতে প্রায় ৫০ সেমি (এক হাত) দূরে দূরে প্রায় তিন চার সেমি গভীর নালার মতো করে তাতে প্রায় ৩০ সেমি (আধ হাত) দূরে দূরে বীজতলা থেকে তোলা শিকড়যুক্ত চারা লাগানো হয়। চারা প্রায় ২৫ সেমি (আধ হাত) বড়ো হলে তাতে কাঠি দিয়ে অবলম্বন দেওয়া হয়। তবে অন্য উঁচু ফল বা বনজ গাছের পাশে লাগালেও ভালো হয়। শীতের শেষে বা বসন্তকালে উপরের পাতা শুকিয়ে গেলে মাটি থেকে থা বলং বা খাম আলু তোলা হয়। প্রতি কাণি জমি থেকে প্রায় চার টন অর্থাৎ প্রতি গাছ থেকে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রাম আলু পাওয়া যায়।

০ বইরা ০

(বাংলা—বহেড়া)

● **ব্যবহার ঃ** বইরা সেঁকে মুখে রাখলে কাশির দমক কমে যায়। বইরা ঘসে কাজলের মতো চোখে লাগালে চোখ ওঠার যন্ত্রণার উপশম হয়। ক্রিমিতে বইরার রস উপকারী। হজমের গোলমালে অজীর্ণতা হলে বইরা ফল খুব উপকারী। ত্রিফলার মধ্যে বাখলা ও আমলাই মধ্যে বইরা একটি। অর্শরোগে এবং কুষ্ঠ রোগে বইরা বহুল ব্যবহৃত হয়। এ-ছাড়া জ্বরে ও শোথ রোগেও বইরা ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়।

● **পরিচিতি ঃ** বইরা হল কমব্রিটেসী (*Combretaceae*) পরিবারযুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল টারমেনেলিয়া বেল্লিরিকা (*Termanalia bellirica*)। এর ইংরেজি নাম হল বেলেরিক মাইরোবলম (Belerik Mirobolom)। বইরার হিন্দি ও বাংলা নাম হল যথাক্রমে বহেরা এবং বহেড়া।

বইরা হল বহুবর্ষজীবী শক্ত কাঠযুক্ত বৃক্ষ। গুচ্ছাকারে সজ্জিত সরল পাতাগুলি প্রায় বার থেকে সতের সেমি (এক বিগত মতো) লম্বাটে হয় এবং শীতকালে পাতা ঝরে যায়। ফুলগুলি স্পাইকের মতো পুষ্পমঞ্জরিতে হয়। বর্ষাকালে এবং হেমন্তকালে ফল পাকে। কুলের আকারের মতো বাদামি রং-এর ফলগুলি ঘন লোমে ঢাকা থাকে। তবে ফল ডিম্বাকৃতির পাশাপাশি গোলও হতে পারে।

● **বংশবিস্তার ঃ** বইরার বংশবৃদ্ধি সাধারণত করা হয় বীজের মাধ্যমে, বীজতলায় বীজ বপন করে প্রায় ৪০ বা ৫০ দিনের মধ্যে রোপণকরার মতো চারা পাওয়া যায়। এজন্য বসন্তকালে বীজ তলায় বীজ বপণ করলে বর্ষাকালে মূলজমিতে চারা লাগানো যায়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** জল নিকাশি ব্যবস্থা যে-কোনো টিলা বা পাহাড়ে বা ঢালে বইরা লাগানো যায়। প্রায় সাত থেকে আট মিটার (১৪ থেকে ১৬ হাত) দূরে দূরে প্রায় ৫০ সেমি (এক হাত) ব্যাস ও গভীরতাযুক্ত গর্ত করা হয়। প্রতি গর্তে প্রায় ৫ থেকে ৭ কিলোগ্রাম গোবর বা জৈবসার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে তার সঙ্গে উঁইপোকা বা পিঁপড়ে দূর করতে সেগুনপাতার রস মিশিয়ে মাটি সমান করা হয়। এরপর গর্তের ঠিক মাঝখানে বীজতলা থেকে তোলা প্রায় দেড় মাসের চারা লাগিয়ে তাতে অল্প জল দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে ঘাস বাছাই করে জল দিয়ে গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া হয়। প্রায় সাত আট বছর থেকে প্রতি বছর প্রতি গাছ থেকে প্রায় ৪০ কিলোগ্রাম বইরা বা বহেড়া পাওয়া যায়।

○ বৃন্দাবন খুম কফুর ○

(বাংলা— নয়নতারা)

● **ব্যবহার ঃ** বহুমূত্র রোগে ছেলে বুড়ো সবার জন্য বৃন্দাবন খুম কফুর খুব উপকারী। রক্তচাপজনিত রোগে ও এটি ব্যবহৃত হয়। এর মূল চূর্ণ করে রোজ সকালে পাঁচ-ছয় গ্রাম করে খেলে ব্লাডপ্রেসার কমে যায়। বৃন্দাবন খুম কফুর পাতার রস মৌমাছি, বোলতা বা ভীমরুলের হুল ফোটানো জায়গায় লাগালে যন্ত্রণার উপশম হয়। ডায়াবেটিক রোগেও বৃন্দাবন খুম কফুর খুব উপকারী। এর পাতার রস বা গাছের নরম কাণ্ড ও পাতা পিযে ক্বাথ বানিয়ে রোজ খেলে ব্লাডসুগার কমে যেতে থাকে।

● **পরিচিতি ঃ** বৃন্দাবন খুম কফুর হল এপোকাইনেসী (*Apokinaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল কেথারেন্থাস রেসিয়াস (*Katharanthus rosius*)। এর ইংরেজি নাম হল পেরিউইঙ্কেল (*Periwinkle*)। হিন্দি নাম হল সদাবাহার এবং বাংলা নাম হল— নয়নতারা।

বৃন্দাবন খুম কফুর হল বহুবর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এগুলি প্রায় একমিটার (দু হাত) পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। ছোটো ভারী পাতাগুলি ডিম্বাকার এবং একপত্রবিশেষ হয়। ফুলের পাপড়িগুলি এক সমতলে উপরদিকে থাকে এবং সারা বছর গাছে কিছু না কিছু ফুল ফোটে যাতে পাঁচটি পাঁপড়ি থাকে। ফুলগুলি সাদা অথবা লালচে হয়। ফলগুলি লম্বাটে ক্যাপসুলের মতো হয় যাতে বীজ থাকে অনেক।

● **বংশবিস্তারে ঃ** বৃন্দাবন খুম কফুর বা নয়নতারার বংশবিস্তার হয় সাধারণত বীজের মাধ্যমে, বীজগুলি ছোটো ছোটো সরিযার মতো হয়। বীজগুলি দেখতে কালসে রং-এর হয়। ফল পাকলে বীজের ক্যাপসুলগুলি রেখে দেওয়া যায় এবং জমিতে বীজ লাগানোর আগে বীজ বার করে পুষ্ট বীজ বাছাই করে লাগানো হয়। একেকটি ক্যাপসুলে বা ফলে প্রায় ২০টি বীজ হয়ে থাকে।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** বৃন্দাবন খুম কফুর গাছগুলির বীজ ছোটো ফুলকপি বা বাধাকপির বীজের মতো হয়। বীজতলায় কপির চারা তৈরি করার মতো করে প্রার চার আঙুল দূরে লাইন করে ঝুরঝুরে মাটির বীজতলায় বপন করা হয়। এরপর মিহি মাটি দিয়ে ঢেকে সামান্য জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে ঘাস বাছাই করে জল দিতে হয়। তিন সপ্তাহের চারা মূল জমিতে লাগানো হয়।

এক কাণিতে প্রায় একটন গোবর বা জৈব সার মিশানো হয় ৪ থেকে ৫ বার লাঙল দিয়ে। এরপর প্রায় ৫০ সেমি (এক হাত) দূরে দূরে লাইন করে বর্গাকারে চারা লাগানো হয় ছোটো ছোটো গর্ত করে। বৃষ্টি না থাকলে প্রায় দু-সপ্তাহ পরপর জল দিতে হয় ও ঘাস বাছাই করে গোড়ার মাটি তোলে দিতে হয়। লাইনে মাটি তুলে দিলে মাঝখানে যে নালা হয় তাতে শীতের সময় সেচ দেওয়া যায় যার সঙ্গে গোয়ালঘরে বা শূকরের বা হাঁস মুরগির ঘর ধোয়া জল মিশিয়ে দেওয়া যায়। প্রতি কাণিতে বছরে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ কিলোগ্রাম শিকড় পাওয়া যায়।

○ চরন্‌দী ○
(বাংলা— নিশিন্দা)

● **ব্যবহার ঃ** চরন্‌দী পাতা গরম করে লাগালে শরীরের যে-কোনো ফোলা জায়গার ফোলা কমে যায়। হাঁপানী রোগ কমে চরনদী গাছের বাকল ছেঁচে ক্বাথ বানিয়ে খেলে। চরনদী পাতার রস জ্বর কমায় এবং কানে পুঁজ হলে এই রস গরম করে দিলে পুঁজ পড়া বন্ধ হয়ে যায়। ঘরের মশা তাড়াতে চরনদী পাতার ধোঁয়া খুব উপকারী। এ-ছাড়া চরনদী পাতা মাঝে মাঝে ভেজে খেলে (কড়াভাজা নয়) স্মৃতিশক্তি বাড়ে বলে দাবী করা হয়।

● **পরিচিতি ঃ** চরন্‌দী হল ভারবেনাসী (*Verbanaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল ভাইটেক্স নিগুন্ডো (*Vitex nigundo*)। এর ইংরেজি নাম হল ভাইটেক্স (Vitex) বা ফাইভ লিপ্‌ড চেযটি ট্রি (*Five leaved chesty tree*)। চরনদীর হিন্দি নাম হল গাম্ভাল এবং বাংলা নাম হল নিশিন্দা।

সাধারণত চরনদী গাছ বাড়ি ঘর বা বাগানের বেড়ায় দেখা যায়। কারণ এগুলি বহুবর্ষজীবী গুল্ম এদের কাণ্ড বেশ শক্ত। কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার রং মেটে রং-এর এবং ঝোপযুক্ত গাছ বিশেষ গন্ধযুক্ত। প্রায় চার মিটার (৮ হাত) লম্বাটে গাছে প্রচুর সরু লম্বাটে যৌগিক পত্র হয়। লম্বাটে পুষ্পমঞ্জরীতে অনেক নীল রং-এর ছোটো ছোটো ফুল হয় গ্রীষ্মকালে।

● **বংশবিস্তার ঃ** চরনদী বা নিশিন্দা গাছের বংশ বিস্তার সাধারণত সরু কাণ্ডের কাটিং থেকে হয়ে থাকে। তবে গাছের বীজ থেকে অথবা

গোড়ায় বেরোনো তেউর বা সাকারের গাছ দিয়েও চরনদী বা নিশিন্দার বংশ বিস্তার হতে পারে।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** ভালো জল নিষ্কাশনযুক্ত যে-কোনো পতিত জমি বা খানাখন্দের পাড়ে চরনদী গাছ লাগানো যায়। তবে যেহেতু চরনদী বহুবর্ষজীবী গাছ, ঘর-বাড়ি, বাগান বা চারা জমির বেড়ায় এর চাষ করা ভালো। বীজ দিয়ে চাষ করলে বাড়ী বা বাগানের চারদিকে প্রায় ২৫ সেমি (আধ হাত) প্রস্ত এবং গভীর নালার মতো করে তার মাটির সঙ্গে প্রতিমিটারে প্রায় এক কিলোগ্রাম জৈব সার বা গোবর মিশিয়ে নেওয়া হয়। এরপর মাটি ঝুরঝুরে করে তার মধ্যে পাতলা করে দু-তিন আঙুল দূরে দূরে বীজ বপন করা হয়। হালকা জল দিয়ে ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। পরে ঘাস বাছাই এর সময় নষ্ট হয়ে যাওয়া চারা তুলে ফেলা হয়। কাটিং লাগালে প্রতি ২০ বা ২৫ সেমি দূরে দূরে কাটিং লাগানো হয়। মাঝে মাঝে ঘাস বেছে গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া হয়। গাছ প্রায় ৫০ সেমি হলে নীচে লম্বাটে বাঁশ দিয়ে আড়াআড়িভাবে বাধা হয় গোড়াগুলিকে।

○ তোয়খা থাইস্‌মু ○

(বাংলা— তেলাকুচা)

● **ব্যবহার ঃ** তোয়খা থাইস্‌মু পাতার রস ডায়াবেটিস রোগে খুব উপকারী। বুকে কফ জমে জ্বর হলে পাতা এবং শিকড়ের রস খেলে তা কমে যায়। আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টও কমে যায় তোয়খা থাইসমুর পাতার রস খেলে। অরুচি হলে পাতার রস খেলে মুখে রুচি ফিরে আসে। শিশুদের জন্য শিশুর মায়ের দুধ কম হলে তোয়খা থাইসমু ফলের রস বের করে গরম করে মধু মিশিয়ে খেলে মায়েদের স্তনের দুধ বাড়ে।

● **পরিচিতি ঃ** তোয়খা থাইসমু বা তেলাকুচা হল কিউকারবিটেসী (*Cucerbitaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল কোক্কিনিয়া গ্র্যান্ডিস (*Coccinia grandis*)। এর ইংরেজি নাম হল আইভি গোর্ড (*givy gourd*)। তোয়খা থাইসমুর হিন্দি এবং বাংলা নাম হল তেলাকুচা।

থাইসমু হল বহুবর্ষজীবী লতানো গাছ যার অনেক শাখাপ্রশাখা হয় যেগুলি আকর্ষের সাহায্যে অন্য গাছ বা বেড়া ইত্যাদির মধ্যে বেয়ে

ওঠে। পাতা প্রায় ১০ থেকে ১৫ সেমি হতে পারে যেগুলিতে প্রায় চার পাঁচটি বড়ো খাঁজ থাকে। পাতার ফলকে অল্প লোম থাকতে পারে। গাছে পুং ফুল ও স্ত্রীফুল (গোড়ায় কড়িযুক্ত) আলাদা হয়। পুং ফুলের রেণু স্ত্রীফুলের উপর ছড়িয়ে পরাগ সংযোগ ঘটালে ফলের সংখ্যা বাড়ে। ফলগুলি অনেকটা ছোটো পটল বা মাকুর মতো হয়। সবুজ ফলে সাদা ডোরা দেখা যায়। পাকা লাল ফলে অনেক বীজ থাকে।

● **বংশবিস্তার ঃ** তোয়খা থাইসমুর বংশবৃদ্ধি করা হয় সাধারণত দু-তিন গিঁটযুক্ত লতানো কাণ্ডের কাটিং দিয়ে। তবে বীজের মাধ্যমেও চাষ করা যায়। বীজ দিয়ে চাষ করলে শীম বা লাউ কুমরের মতো দুমিটার (৪ হাত) দূরে দূরে গোলাকার বাদা করে কাণিতে প্রায় ৫০০ গ্রাম বীজ লাগানো যায়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** ভালো জলনিষ্কাশনযুক্ত টিলা বা চারা জমিতে লাঙলের সঙ্গে প্রতিকাণিতে প্রায় দু-টন গোবর বা জৈব সার মিশিয়ে জমি সমান করা হয়। এরপর দুমিটার দূরে দূরে লাইন করে বর্গাকার ভাবে শিকড়যুক্ত কাটিং লাগানো হয়। জল ছিটিয়ে দিয়ে ছায়া দেওয়া হয়। পরে গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হয় এবং গাছ প্রায় ২৫ সেমি লম্বা হলে তাঁতে কাঠি বা কঞ্চি দিয়ে বাউনি বানাতে হয়। তবে বাগানের বেড়া, গাছ ইত্যাদির পাশে নালা বা বাদা তৈরি করে তাতে তোয়াখা থাইসমু বা তেলাকুচার চাষ করা ভালো।

○ ধুতুরা ○

(বাংলা— ধুতুরা)

● **ব্যবহার ঃ** দেহের কোণ জায়গায় ফোঁড়া হলে ধুতুরা পাতার রসের সঙ্গে সামান্য ঘি মিশিয়ে লাগালে ফোঁড়া পেকে ওঠে তাড়াতাড়ি। আবার দেহের কোনো অংশ ফুলে গেলে বা ব্যথা হলে ধুতুরা পাতার রস গরম করে ঘন করে লাগালে ব্যথা কমে যায়। হাঁপানীতে ধুতুরা শুকনো পাতা দিয়ে সিগারেটের মতো টানলে শ্বাসকষ্ট কমে যায় বলে কবিরাজরা বলে থাকেন। মায়েদের স্তনের ব্যথায় ধুতুরা পাতা ছেঁচে রস নিয়ে তার সঙ্গো হলুদ ও চুন মিশিয়ে প্রলেপ দিলে ব্যথা কমে যায়।

● **পরিচিতি ঃ** ধুতুরা হল সোলানেসি (*Solanaceae*) পরিবারভুক্ত

উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল ধাতুরা মেটেল (*Datura metal*)। এর ইংরেজি নাম হল থর্ন আপেল (*Thorn apple*) এবং হিন্দি নাম হল ধাতুরা। বাংলায় এবং ককবরকে এর নাম একই (ধুতুরা)।

ধুতুরা গাছ বহুবর্ষজীবী গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। যে-কোনো পতিত জমি, খানাখন্দ, টিলার উপর, ছড়া নদী বা নালার পারে ধুতুরা গাছ দেখা যায়। ধুতুরা সাদা জাতের এবং এবং বেগুনি জাতের হতে পারে। ডিম্বাকার বড়ো পাতাগুলিতে খাঁজকাটা থাকে। সবুজ বৃতির মধ্যে লম্বাটে ফানেলের মতো বড়ো ফুল হয়। ফলগুলি গোলাকার ছোটো বলের মতো যার উপর প্রচুর কাঁটা থাকে। ফলের ভিতর ছাই রং-এর বীজ হয়।

● **বংশবিস্তার ঃ** ধুতুরার বংশবিস্তার প্রধানত হয় বীজের মাধ্যমে। ধুতুরার বীজ সরাসরি জমিতে বা গর্তে লাগিয়ে তার চাষ করা যায়। ধুতুরার গোটা বিযাক্ত বলে ফল ও বীজগুলি অবশ্যই সাবধানে রাখতে হয় যাতে ছোটোরা হাত না দেয়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** মূলজমি বা পতিত জমিতে ধুতুরার চাষ না করে টিলার কিনারে বা নালার কিনারে অথবা ছড়া বা নদীর পারে গাছ লাগানো যায়। তবে বাগানের বা বাড়িঘরের বেড়ার মধ্যেও ধুতুরা গাছ লাগানো যায়। প্রায় ২৫ সেমি (আধ) হাত ব্যাস এবং গভীরতাযুক্ত গর্ত করে তাতে এক কিলোগ্রাম গোবর বা জৈব সার দিয়ে পুষ্ঠ বীজ বপন করা হয়। তারপর জল দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে ঘাস বাছাই করে দিতে হয় এবং গোড়ার মাটি তুলে দিতে হয়। সাত আট মাস পর থেকেই পাতা ও ফুল তুলে ব্যবহার করা যায়। কাণি প্রতি বছরে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ কিলোগ্রাম পাতা ও ফুল পাওয়া যায়।

○ লথ বা লেটক ○

(বাংলা— ভেরন বা ভেরেন্ডা)

● **ব্যবহার ঃ** লেটকের তেল পরিমাণ মতো খেলে কৃমি বের হয়ে যায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। লেটকের তেল থেকে তৈরি হয় গর্ভনিরোধক ঔযধ। এর বীজ পিযে ফোঁড়ায় লাগালে ফোঁড়া তাড়াতাড়ি পেকে পুঁজ বেরিয়ে যায়। মা ও মেয়েদের মাসিকের ঠিক পূর্বে ব্যথা হলে লেটক বা ভেরেন্ডার পাতা অল্প গরম করে তলপেটে স্যাঁক দিলে ব্যথা কমে যায়। অন্যদিকে আবার অল্প পরিমাণ বীজের তেল আদার

রসের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা অথবা প্রোস্টেটের সমস্যা কমে যায়।

● **পরিচিতি ঃ** লেটক বা ভেরেন্ডার পরিবার হল ইউফোরবিয়েসি (*Euphorbiaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল রিসিনাস কম্যুনিস (*Ricinus communis*)। এর ইংরেজি নাম হল ক্যাস্টর (*Castor*)। এবং হিন্দী ও বাংলা নাম যথাক্রমে হল লেটক এবং ভেরেন্ডা বা রেড়ী।

নরম ফাঁপা কাণ্ডযুক্ত প্রায় তিন থেকে চার মিটার (৬ থেকে ৮ হাত) উঁচু গাছগুলি লম্বা ফাপা বোঁটাযুক্ত বড়ো বড়ো পাতা নিয়ে ছাতার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বড়ো বড়ো পাতাগুলি গোল হলেও তাতে অনেক সরু সরু খাঁজ থাকে। রেসিম জাতীয় পুষ্পমুঞ্জরীর উপরে থাকে পুরুষ ফুল এবং নীচে গুচ্ছাকারে স্ত্রীফুল থাকে। প্রায় গোলাকার ফলে কাঁটা থাকে এবং ফলের ভেতর রসালো তেলযুক্ত বীজ থাকে সাদা দাগযুক্ত লম্বাটে মটর দানার মতো।

● **বংশবিস্তার ঃ** লেটক বা ভেরেন্ডার বংশবৃদ্ধি হয় বীজের মাধ্যমে। বীজ সরাসরি জমিতে লাগানো হয়। প্রতি কাণিতে লেটক বা ভেরেন্ডার বীজের দরকার হয় প্রায় দু থেকে তিন কিলোগ্রাম। নিরোগ, পুষ্ট ও উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ করে চাষ করা দরকার। অঙ্গজ জননের মাধ্যমেও লেটক বা ভেরেন্ডার চাষ করা যায়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** ভালো জল নিষ্কাসনযুক্ত যে-কোনো পতিত জমিতে লেটকের চাষ করা যায়। তবে জমিতে জৈব বা আবর্জনা সার থাকা চাযের পক্ষে খুব ভালো। জমিতে তিন চার বার লাঙল দিয়ে মাটির সঙ্গে কাণি প্রতি প্রায় ৫টন জৈব বা আবর্জনা সার মিশিয়ে জমি সমান করা হয়। এরপর প্রায় এক মিটার (দু হাত) দূরে দূরে লাইন করে প্রায় ৫০ সেমি (এক হাত) দূরে দূরে দুটি করে বীজ লাগানো হয় গর্ত করে। বৃষ্টি না হলে অল্প জল দিয়ে মাদা পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। আট দশ দিন পর নতুন গজিয়ে ওঠা চারার গোড়ার মাটির স্তর আস্তে আস্তে ভেঙে দিয়ে আবার জল দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে ঘাস বাছাই করে গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হয়। প্রায় তিন চারমাস পর ফল পাকিলে প্রথম ফসল তোলা যায়। এরপর প্রায় ৪০ দিন পর দ্বিতীয় বার এবং তার ৬০ দিন পর তৃতীয়বার ফসল তোলা যায়। প্রতি কাণিতে প্রায় ৫০০ কিলোগ্রাম ফল পাওয়া যায়।

○ পূর্ণদলাক ○

(বাংলা— পুনর্ন্বা)

● **ব্যবহার ঃ** পূর্ণদলাকের রস বাতরোগে খুব উপকারী, পরপর দু-চার দিন তিন-চার চামচ করে খেলেই হয়। আবার শোথ রোগে পূর্ণদলাকের শিকড় আদার সঙ্গে সেদ্ধ করে দুবেলা খেলে তা কমে যায়। পূর্ণদলাকের রস বিছা, বোলতা, বা ভীমরুলের হুল ফুটলে সে জায়গায় আস্তে আস্তে লাগালে যন্ত্রণার উপশম হয়। মূত্রাশয়ের পাথরী জাতীয় রোগে পূর্ণদলাক সেদ্ধ করে সেদ্ধ জল দুবেলা খেলে অনেক উপকার হয়। কিডনীজনিত রোগেও পুর্ণদলাকের রস কাঁচা অবস্থায় রুটি বা অল্প ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে উপকার হয়।

● **পরিচিতি ঃ** পূর্ণদলাক হল নিকটাজিনেসী (*Nictaginaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল বোয়েরহেবিয়া ডিফুজা (*Boerhavia diffusa*)। পূর্ণদলাকের ইংরেজি নাম হল হগউইড (*Hogweed*)। এর হিন্দি এবং বাংলা নাম হল পুনর্ণবা।

পূর্ণদলাক বহুবর্ষজীবী বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। লতানো গাছে অনেক শাখাপ্রশাখা হয়। ছোটো পাতা প্রায় গোলাকার এবং উপর পৃষ্ঠ সবুজ হলেও পাতার নীচটা সাদা হয়। ডাল ও পাতায় বেগুনি রং দেখা যায়। পূর্ণদলাক গাছের পাতা শুকিয়ে গেলে মনে হয় গাছ মড়ে গেছে. কিন্তু পরে বীজ থেকেই আবার নতুন গাছ হয়। এজন্য একে বলা হয় পুনর্নবা। ছোটো ফুলগুলি গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে এবং শরতের শেষে ফুল ফোটে এবং শীতে ফল হয়।

● **বংশবিস্তার ঃ** পূর্ণদলাক বংশ বিস্তার করে বীজ থেকে। তবে দু-তিনটি পর্বযুক্ত কান্ডের অংশ বা কাটিং দ্বারাও চাষ করা যায়। তবে মাটির সঙ্গে মিশে থাকা কান্ডের অংশ নেওয়া দরকার হয় কারণ মাটির সংস্পর্শে থাকা পর্বে শিকড় গজানো থাকে। জমিতে লাগানোর পূর্বে দু-তিন পর্বযুক্ত কাটিং নার্সারীতে পুঁতে শিকড় গজিয়ে নেওয়া যায় দু-তিন সপ্তাহে।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** বেলে বা এঁটেল দোআঁশ মাটিযুক্ত জমিতে বা টিলায় আড়াআড়ি তিন চারবার চাষ দিয়ে লাঙলের সঙ্গে কাণি প্রতি তিন থেকে চার টন গোবর বা জৈব সার মিশিয়ে জমি সমান করা হয়। এরপর প্রায় ২৫ থেকে ৩০ সেমি (প্রায় আধ হাত) দূরত্বে লাইন করে বীজ বোনা যায়। পরে ঘাস বাছাই করার সময় ২৫ সেমি দূরত্বে

বলিষ্ঠ গাছ রাখা হয়। কাটিং লাগালেও একই দূরত্বে লাগাতে হয়। কাটিং এর পুরো কাণ্ড-পর্ব ও শিকড়সহ মাটির নীচে রাখা হয় উপরে মাটি দিয়ে। বৃষ্টি না হলে জল দিতে হয়। দু-তিন সপ্তাহ অন্তর ঘাস বাছাই করা হয়। বর্ষার সময় থেকে পাতা ও লতা ফসল তোলা যায় যা প্রায় হেমন্তকাল পর্যন্ত চলে। কাণি প্রতি প্রায় ৭০০ কিলোগ্রাম ফলন পাওয়া যায়।

○ কুশাকাথং ○
(বাংলা— পাথরকুচি)

● **ব্যবহার ঃ** কুশাকাথং-এর পাতা প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা এবং প্রোস্টেটের সমস্যা দূর করে। চোখ উঠলে কুশাকাথং-এর রস চোখের পাতার উপর লাগালে চোখের যন্ত্রণা লাঘব হয়। পেটের ব্যথায় কুশাকাথং পাতা বেটে লাগালে ব্যথা কমে যায়। পাতার রস এক-দু চামচ গরম করে খেলে পেট ব্যথা কমে যায়। আবার পাতার রস তিন চার চামচ করে দিনে দু-তিন বার খাওয়ালে পাতলা পায়খানা শক্ত হয়ে যায়। খালি পেটে দু-চারদিন পাতার রস খেলে আমাশয় কমে যায়। এ-ছাড়া কুশাকাথং বা পাথরকুচির রস কফ ও সর্দিতেও উপকারী।

● **পরিচিতি ঃ** কুশাকাথং বা পাথরকুচি হল ক্রাসুলেসি (*Cruculaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল ব্রায়োফাইলাম পিন্নাটাম (*Bryphylum Pinnatum*)। ইংরেজি নাম হল ইরিস্প (*Irisp*)। হিন্দি নাম হল জেকম্ হায়াৎ। কুশাকাথং-এর বাংলা নাম হল পাথরকুচি।

কুশাকাথং বা পাথরকুচি গাছ বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ যেগুলি ৫০ সেমি থেকে ৭৫ সেমি (এক থেকে দেড় হাত) লম্বা হয়। কাণ্ড থেকে জোড়া পাতা দুদিকে বের হয়। পাতাগুলি মাংসল ও ভারী এবং খাঁজকাটা। বর্ষাকালে পাতার মধ্যে ছোটো ছোটো শিশু চারা তৈরি হয় এবং পাতার কিনারে লটকে থাকে। গুচ্ছাকারে ফুল থাকে যেগুলি চোঙ-এর মতো। ফুলে লাল বা সাদা দাগ থাকে। গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

● **বংশবিস্তার ঃ** কুশাকাথং-এর বংশবৃদ্ধি হয় পাতার মধ্যে জন্মানো শিশু চারাগুলির দ্বারা। এছাড়া শিকড়যুক্ত তেউর বা সাকার দিয়েও বংশ বিস্তার করা যায়। সাধারণভাবে পাতার সাহায্যে বীজ তলায় চারা

তৈরি করা হয়। বীজতলায় মাটিতে লাইন করে পুষ্ট পাতা মাটির নীচে চাপা দিয়ে জল ছিটিয়ে রেখে দিলে এক মাস সময়ে প্রতি পাতা থেকে লাগানোর উপযোগী তিন চারটি চারা পাওয়া যায়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** জলনিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত পতিত জমিতে তিন চারবার লাঙল দিয়ে প্রতি কাণিতে প্রায় দুই টন গোবর বা জৈবসার মিশিয়ে মাটি সমান করা হয়। এরপর প্রায় ৫০ সেমি (এক হাত) দূরে লাইন করে বর্গাকার চারা রোপন করা হয়। এরপর জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি ১০ বা ১৫ দিন পরপর জল দিয়ে গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া হয়। প্রতি বছর প্রতি কাণি থেকে প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ কিলোগ্রাম কুশাকাথং বা পাথরকুচির পাতা পাওয়া যায়।

○ আমচুকাই ○

(বাংলা— আমরুল)

● **ব্যবহার ঃ** আমচুকাই বা আমরুল শাকের মতো অথবা বেটে খাওয়া যায়। তাতে ভালো ঘুম হয়। পাতার রস কফ ও সর্দিতে উপকারী। আমচুকাই জ্বর এবং আমাশয়ে উপকারী। আমাশয়ে আমচুকাই গাছের রস মধু বা চিনির সঙ্গে খেলে উপকার পাওয়া যায়। এ-ছাড়া আমচুকাই বা আমরুল পাতা ছেঁচে স্কার্ভি জাতীয় রোগে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। আমচুকাই-এর বীজের স্পোর কামোদ্দীপক, শ্লেষানিঃসারক এবং প্রস্রাবের গোলমাল বা প্রাস্টেটে উপকারী।

● **পরিচিতি ঃ** আমচুকাই বা আমরুল অক্সালিডেসী (*Oxolidaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল অক্সালিস কপিকুলেটা (*Oxalis copiculata*)। আমচুকাই এর হিন্দি নাম হল খট্টি পট্টি এবং বাংলা নাম হল আমরুল।

স্যাঁতস্যেঁতে জায়গায় গাছের নীচে বা ফসলের জমির আশেপাশে দেখা যায়। লতানো ছোটো গাছগুলি বুকে হেঁটে চলে। মাটির সঙ্গে থাকা পর্ব থেকে শিকড় বের হয়। পাতায় তিনটি খণ্ড থাকে এবং পাতার বোটা লম্বাটে মোটা সুতোর মতো হয়। বর্ষাকালে বেশি দেখা যায়।

● **বংশবিস্তার ঃ** আমচুকাই বা আমরুলের স্পোর বা বীজ হয় বংশবিস্তারের জন্য যাতে সেগুলি দূরে দূরে গিয়েও বংশরক্ষা করতে পারে। তবে গাছের শিকড়যুক্ত কাণ্ড দিয়ে বংশ বিস্তার করা ভালো।

মাটির সঙ্গে থাকা কাণ্ডের পর্বের শিকড়যুক্ত ছোটো ছোটো কাটিং দিয়ে চাষ করা ভালো।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** যে-কোনো অল্প আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে জায়গায় প্রায় দশ থেকে বার সেমি দূরে দূরে চারা লাগানো যায়। লাগানোর পূর্বে অন্যান্য ঘাস লতা পরিষ্কার করে তা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে সমান করে নিতে হয়। এরপর প্রায় চার থেকে পাঁচ সেমি (তিন আঙুল) দূর গর্ত করে তাতে শিকড়সহ গোড়া ঢুকিয়ে লাগানো হয়। বেশি রৌদ্র হলে ছায়া দিতে হয়। ছায়া যুক্ত আর্দ্র মাটিতে আর কোনো সার দিতে হয় না কারণ সে মাটি কিছুটা উর্বর থাকে। প্রতি কাণি থেকে প্রতি মরশুমে প্রায় ১০০ কিলোগ্রাম ফসল পাওয়া যায় দু-তিন বার কাটিং নিলে।

○ দুখুপুই ○

(বাংলা— গেঁদাল)

● **ব্যবহার ঃ** দুখুপুই বা গেঁদাল পাতা পেট খারাপ হলে পাহাড়ের সব বাড়িতে ব্যবহৃত হয়। পাতা ছেঁচে রস নিয়ে অথবা পাতা ভেজে অথবা পাতা বেটে খাওয়া হয়। পাতলা জলের মতো পায়খানায় দুখুপুই পাতার রস খেলে লুজমোশন বন্ধ হয়। আমাশয়ে রোজ সকাল বেলায় দু-তিন চামচ করে পাতার রস খেলে ক্রনিক আমাশয় কমে যায়। অজীর্ণ রোগে দুখুপুই বা গেঁদাল পাতার ঝোল খেলে উপকার পাওয়া যায়।

● **পরিচিতি ঃ** দুখুপুই বা গেঁদাল হল রুবিয়েসি (*Rubiaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল পিয়াডেরিয়া ফয়েটিডা (*Peaderia foetida*)। এর বাংলা নাম হল গেঁদাল বা গন্ধমাদাইল।

বহুবর্ষজীবী লতানো গাছ। একক পত্রগুলি ডিমের মতো। পাতাগুলি প্রায় আট দশ সেমি লম্বা এবং প্রায় চার থেকে ছয় সেমি পাশ হয়। পাতাগুলিতে খুব বিরক্তিকর (*foul smell*) গন্ধ থাকে। এজন্য একে গন্ধ মাদাইল বলে। ফুল ফল খুব কম পরিমাণে থাকে বলে প্রায় দেখা যায় না বল্লা চলে। লতানো গাছ বেড়া বা অন্যগাছে জড়িয়ে উপরে ওঠে।

● **বংশবিস্তার ঃ** সাধারণত শিকড়ের মাধ্যমে দুখুপুই বা গেঁদালের বংশ বিস্তার হয়। মাটিতে লেগে থাকা কাণ্ডের পর্বে শিকড় জন্মায়। এই শিকড় যুক্ত কাণ্ডের কাটিং বা শিকড়ের টুকরো লাগিয়ে চাষ করা হয়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** যে-কোনো জায়গায় দুখুপুই চাষ করা যায়। তবে বেড়া বা অন্যগাছের গোড়ায় চাষ করা ভালো। প্রায় ২৫ সেমি গভীরতা ও ব্যাসযুক্ত গর্তে প্রায় এক কিলোগ্রাম গোবর মিশিয়ে মাঝখানে শিকড় বা শিকড়যুক্ত কাটিং লাগানো হয়। সামান্য জল দিয়ে রাখা হয়। দু-তিন সপ্তাহ পরপর ঘাস বাছাই করে মাটি তুলে দিতে হয়। দ্বিতীয় বছর থেকে প্রতি ঝোপ থেকে প্রায় দু কিলোগ্রাম পাতা পাওয়া যায়।

○ কুইচাখা ○

(বাংলা— কুরচি)

● **ব্যবহার ঃ** কুইচাখা বা কুরচি গাছের বাকলের রস খেলে আমাশয় রোগের উপশম হয়। কুইচাখা পাতার রস আবার ছোটো বড়ো সবার কৃমিনাশ করে। মাঝে মাঝে জ্বর হয় অথচ তা কোনো ঔষধে কাজ হচ্ছে না এমন অবস্থায় অর্থাৎ গায়ে গায়ে জ্বর থাকলে কুইচাখা বা কুরচি গাছের বাকলের রস অল্প অল্প করে খেলে জ্বর কমে যায়।

● **পরিচিতি ঃ** কুইচাখা বা কুরচি হল এপোকাইনেসী (*Apocynaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল হলারহেনা এন্টিডিসেন্টেরিকা (*Holarrhena antidysenterica*)। এর হিন্দি নাম কর্চী ও বাংলা নাম হল কুরচি।

বহুবর্ষজীবী শক্তকাঠযুক্ত এবং কাঠের উপর মাংসল বা কলাযুক্ত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। ভারী বাকলের রং বাদামি বা ছাই রং-এর হয়। লম্বাটে একক পাতা হয় মূল কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখায়। শীতে পাতা ঝরে যায়। সাদা ফুলগুলি গুচ্ছাকারে হয়। লম্বাটে ফল সামান্য বাকানো থাকে। বীজ লম্বাটে ডিমের মতো হয়।

● **বংশবিস্তারে ঃ** যে-কোনো মাটি বা পতিত জমিতে কুইচামার চাষ করা যায় বীজের মাধ্যমে। তবে গাছের শিকড় কেটেও কুইচামা বা কুরচির বংশ বিস্তার করা যায়। বিশেষ করে বেড়ার খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং সঙ্গে ভেষজ ঔষধের জন্য শিকড় থেকে বংশ বিস্তার করা ভালো।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** পুরানো বেড়া বা যেখানে নতুন বেড়া দেওয়া হবে তার পাশে প্রায় দু মিটার (চার হাত) দূরে দূরে প্রায় ২৫ সেমি (আধ হাত) ব্যাস ও গভীরতাযুক্ত গর্ত করা হয়। প্রতিগর্তে প্রায় এক

কিলোগ্রাম গোবর বা জৈবসার মিশিয়ে মাটি সমান করা হয়। এরপর কুইচামা বা কুরচি গাছের পুষ্ট শিকড় রোপণ করা হয়। অল্প জল দিয়ে দু-চারদিন ঢেকে রাখা হয়। এরপর গোড়ার ঘাস বাছাই করে মাটি তুলে দেওয়া হয়। শুকনা দিনে প্রতি গাছের চারদিকে নালি করে জল দিতে হয়। দ্বিতীয় বছর থেকে প্রতি বছর প্রতি গাছ থেকে প্রায় তিন কিলোগ্রাম বাকল পাওয়া যায়।

○ আংগন ○

(বাংলা— আকন্দ)

● **ব্যবহার ঃ** বাতরোগে আংগনের পাতা গরম করে সেক দিলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া রিউমেটিক ব্যথায়ও আংগনের পাতা গরম করে সেক দিলে ব্যথা কমে যায়। আংগন গাছের বাকলের রস সর্দি ও কাশিতে উপকারী। শরীরের কোনো অংশ ফুলে গেলে আংগন বা আকন্দ পাতার পুলটিস্ দিলে ফোলা কমে যায়। আরথ্রাইটিস ব্যথায় আংগণ পাতা গরম করে বেঁধে রাখলে ব্যথা কমে যায়।

● **পরিচিতি ঃ** আংগন বা আকন্দ এপোকাইনেসি (*Apocynaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল ক্যালট্রপিস জাইগেন্টিয়া (*Calotropis gigantia*)। এর হিন্দি নাম হল আক এবং বাংলা নাম হল আকন্দ।

আংগন বা আকন্দ হল বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড এবং শাখাপ্রশাখা নরম। কোনো অংশ ভাঙলে সাদা দুধের মতো রস বের হয়। কাণ্ড বা ডালের পর্ব থেকে বোঁটাহীন দুটি পাতা দুদিকে বের হয়। পাতাগুলি বড়ো এবং ডিম্বাকৃতি ও খসখসে। সাইমোস জাতীয় পুষ্পমঞ্জরীতে উভলিঙ্গ ফুল হয় যেগুলির বৃতি সংযুক্ত থাকে।

● **বংশবিস্তার ঃ** আংগন বা আকন্দ বীজ থেকে বংশবিস্তার করে। যে-কোনো ঝোপঝাড় বা ছড়া নদীর কিনারে পতিত জমিতে বীজ থেকে আপনা থেকেই চারা উঠতে দেখা যায়। তবে নার্সারি বেডে বীজ থেকে চারা তৈরি করে গাছ লাগানো ভালো।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** প্রায় সবরকম প্রান্তিক বা পতিত জমিতে হয় বলে এর জন্য আলাদা জমি নষ্ট না করে জমি বা বাগানের বেড়ায় এই ঝোপযুক্ত বহুবর্ষজীবী গাছ লাগানো ভালো। প্রায় ২৫ সেমি (আধ

হাত) ব্যাসও গভীরতাযুক্ত গর্তে এক কিলোগ্রাম জৈব সার বা গোবর সার দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে চারা লাগানো যায়। পরে সামান্য জল দেওয়া হয় এবং প্রতি দু-তিন সপ্তাহে ঘাস বাছাই করে মাটি তুলে দেওয়া হয়। শুকনা দিনে চারার চারদিকে নালা করে জলসেচ দিতে হয়। প্রতি বছর প্রতি গাছ থেকে প্রায় পাঁচ কিলোগ্রাম আংগন বা আকন্দ পাতা পাওয়া যায়।

○ সজন ○

(বাংলা— সজিনা)

● **ব্যবহার ঃ** সজন বা সজিনার পাতা, বাকল, ফল, ফুল সবই খুব উপকারী। হৃদরোগে সজনের শিকড়ের বাকল এবং গর্ভপাতে সজনের মূল উপকারী। দাঁদের কষ্টে কাণ্ডের ছাল বেটে লাগালে উপশম হয়। প্রস্রাবের গোলমাল বা প্রোস্টেটের সমস্যায় সজনের বীজ খুব উপকারী। সজন ফল যকৃত জনিত রোগে খুব উপকারী। বাতের ব্যথায় সজনের বীজের তেলযুক্ত রস মালিশ করলে বাতের ব্যথা কমে যায়। এ-ছাড়া সজন জ্বর, কৃমি, কফ হিস্টিরিয়া ইত্যাদি রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।

● **পরিচিতি ঃ** সজন বা সজিনা হল মরিঙ্গেসী (*Moringaceac*) পরিবারযুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল মরিঙ্গা অলেইফেরা (*Moringa oleifera*)। ইংরেজিতে সজনের নাম হল ড্রামস্টিক (*Dram stick*) অর্থাৎ ঢোল বাজানোর কাঠি। বাংলায় একে বলে সজিনা।

বহুবর্ষজীবী নরম কাণ্ডযুক্ত মাঝারি ধরনের বৃক্ষ যা প্রায় সাত আট মিটার (১৪ থেকে ১৬ হাত) পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। লম্বাটে যৌগিক পত্রে কয়েকটি প্রশাখায় অনেক ছোটো ছোটো প্রায় এক সেমি (আঙুলের নখের মতো) পত্রক থাকে। কাণ্ডের বাকল কেটে দিলে তা দিয়ে আঠা বের হয়। ফুলগুলি গুচ্ছাকার হয় যা থেকে প্রথম সরু ও তা বড়ো হয়ে কাঠির মতো ফল হয়, যা বাজারে বিক্রি হয়। কাঠির মতো ফলে সাজানো পাখাযুক্ত বীজ হয়।

● **বংশবিস্তার ঃ** সজনের বংশবিস্তার করা যায় বীজের মাধ্যমে এবং লম্বাটে খুঁটির মতো ডাল দিয়ে। জমির পরিমাণ কম বলে খুঁটির মতো ডাল দিয়ে বংশবিস্তার করা ভালো। তাতে বেড়ার খুঁটিও হয় যা অনেকদিন গাছের মতো থাকে।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** পুষ্ট প্রায় মোটা লাঠির মতো সজনের ডাল জোগার করে প্রায় পাঁচ মিটার (দশ হাত) দূরে দূরে লাগানো হয়। প্রায় ৫০ সেমি (আধ হাত) ব্যাস ও গভীরতাযুক্ত গর্ত করে তার মধ্যে প্রায় দুচামচ সেগুন পাতার রস দিলে উঁই পোকার আক্রমণ কম হয়। এরপর প্রায় ১৫ সেমি গর্তের মধ্যে পুষ্ট শাখার ডাল রোপন করা হয়। গোড়ায় যেন জল না জমে সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। আজকাল বারমাসি (বছরে দুবার ফুল ফল হয়) সজনের ডাল পাওয়া যাচ্ছে।

○ কৃষ্মকলি ○

(বাংলা— নীল অপরাজিতা)

● **ব্যবহার ঃ** কৃষ্মকলি বা নীল অপরাজিতাকে নীলকণ্ঠ ফুলও বলা হয়। কারণ সাপের কামড়ে এর মূল বেটে খাওয়ালে বা যে-কোনো বিষক্রিয়া হলে মূল বাটা খাওয়ালে উপকার হয়। খাওয়ানোর পর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারও দেখানো দরকার হয়। কানের ব্যথায় পাতার রস গরম করে ব্যবহার করলে ব্যথার উপশম হয়। মূলের রস শোথে বা গলগণ্ড রোগে উপকারী। এছাড়া মূলের রস কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে।

● **পরিচিতি ঃ** কৃষ্মকলি বা নীল অপরাজিতা হল প্যাপিলিওনেসী (*Papilionaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল ক্লাইটোরিয়া টারনাটিয়া (*Clitoria ternatea*)। ইংরেজিতে এর নাম হল বাটারফ্লাই (*Butterfly*)। বাংলায় কৃষ্মকলিকে বলে নীল অপরাজিতা।

বহুবর্ষজীবী লতানো গাছ হল কৃষ্মকলি যেগুলি বেড়া বা অন্য গাছ অবলম্বন করে উপরে উঠে। প্রায় দশ বার সেমি লম্বাটে পাঁচ ফলকযুক্ত যৌগিক পত্র হয় যার পত্রকগুলি ডিম্বাকার ও দুই থেকে তিন সেমি। ফুল নীল হয় অথবা সাদা হয়। ফলগুলি শুটি জাতীয় সরু যা ৮ সেমি লম্বাও চ্যাপটা ফ্রেঞ্চবীনের মতো হয় যার মধ্যে পাঁচ সাতটি বীজ থাকে।

● **বংশবিস্তার ঃ** সাধারণত বীজের মাধ্যমে কৃষ্মকলির বংশবিস্তার হয়ে থাকে। তবে লতানো কাণ্ডের মাটির সঙ্গে লেগে থাকা অংশের পর্বে শিকড় বেরোলে তার কাটিং দিয়েও চাষ করা যায় কৃষ্মগুলি বা নীল অপরাজিতার।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** প্রায় ৫০ সেমি (এক হাত) ব্যাস ও গভীরতাযুক্ত গর্ত করে তাতে প্রায় দু কিলোগ্রাম গোবর বা জৈব সার মিশিয়ে মাটি সমান করা হয়। এরপর ঠিক মাঝখানে অন্তত তিন চারটি শিকড়যুক্ত কাটিং অথবা দশটি কৃষ্ণকলির বীজ লাগানো হয় মাদা তৈরি করে। অল্প জল দিয়ে বীজ বা চারা ঢেকে দেওয়া ভালো। বাড়ি বা বাগানের বেড়ার পাশে প্রায় তিন মিটার (৬ হাত) দূরে দূরে মাদা করা যায়। আবার অন্য গাছের গোড়ায়ও মাদা তৈরি করা যায়। মাঝে মাঝে ঘাস বাছাই করে গোড়ায় মাটি দিতে হয়। প্রায় ২০ বা ২৫ সেমি (আধ হাত) লম্বা হলে চারাগুলিকে বাউনির সঙ্গে হালকা ভাবে বেঁধে দিতে হয়। শুখনা দিনে গোড়ায় মাদার চারদিকে নালি করে জল দিতে হয়। বছরে প্রতি মাদা থেকে প্রায় ৫ কিলোগ্রাম পাতা ও শিকড় পাওয়া যায়।

○ আমলাই ○

(বাংলা— আমলকী)

● **ব্যবহার ঃ** আমলাই পাকলে তার বীজের গুঁড়ো খেলে শ্বেতপ্রদর কমে যায়। ত্রিদোষ নাশক ত্রিফলার একটি ফল হল আমলাই। কাচা বা পাকা ফল অথবা শুকনো ফলই বিভিন্ন ঔষধী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমলাই আমাশয়, অনিদ্রা, অম্লপিত্তে, লিভারজনিত অসুখে খুব উপকারী। মেহ রোগে আমলকীর মোরব্বা খেলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া আমলাই দাস্ত পরিষ্কার করে। একটি সিগারেট খেলে যে ক্ষতি হয় তা দূর করতে পারে একটি আমলাই।

● **পরিচিতি ঃ** আমলাই হল ইয়োর্ফোবিয়েসী (*Euphorbiaceae*) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম হল এমব্লিকা অফিসিয়ানিলিস (*Emblica officianalis*)। ইংরেজিতে আমলাইকে বলে ইন্ডিয়ান গোজ বেরী (*Indian Goose berry*)। হিন্দিতে একে বলে আঁউলা এবং বাংলায় বলে আমলকী।

আমলাই একটি বহুবর্ষজীবী শক্ত কাঠযুক্ত অনেক শাখাপ্রশাখাযুক্ত বৃক্ষ। পাতাগুলি যৌগিক পত্র হয় যেগুলি অনেক ছোটো ছোটো পত্রক নিয়ে গঠিত হয়। শীতকালে আমলাই-এর পাতা ঝরে যায়। গ্রীষ্মের শুরুতেই সবুজ রঙের ছোটো ছোটো ফুল হয় এবং তা থেকে গোলাকার শিরযুক্ত ফল হয়। হালকা সবুজ ফলগুলি পাকলে হালকা হলদে হয়।

● **বংশবিস্তার ঃ** আমলাই-এর বংশবিস্তার বিশেষভাবে হয় বীজের মাধ্যমে। তবে সরু ডালে কলম করেও বংশবিস্তার করা যায়। পাকা আমলাই-এর ভেতর কালসে খাঁজযুক্ত বীজগুলি ভালোভাবে শুকিয়ে চারা তৈরি করে নেওয়া যায়। এরপর বীজতলায় চারা করে অথবা সরাসরি মূলজমির গর্তে আমলাই লাগানো যায়।

● **চাষ পদ্ধতি ঃ** ভালো জাতের আমলাই (আনন্দ, বারাসি, কাঞ্চন, ফ্রেনসিস ইত্যাদি) এনে তার থেকে বীজ বের করা যায়। নতুবা সরাসরি বীজ আনা যায়। টিলা, চারাজমি, ছড়া বা নদীর পারে পতিত জমিতে যেখানে জল দাড়ায় না সেখানে প্রায় ৬ মিটার (১২ হাত) দূরে চারা লাগানো হয় গর্তে। প্রতিটি গর্ত হয় ৫০ সেমি (প্রায় এক হাত) ব্যাস ও গভীরতাযুক্ত করে তাতে প্রায় ১০ কিলোগ্রাম গোবর বা জৈব সার দিয়ে চারা লাগানো হয়। মাঝে মাঝে জলসেচ দিয়ে গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া হয়। প্রায় ৬ বা ৭ বছরে ফলধরে এবং বছরে প্রতি গাছে প্রায় ৫০ কিলোগ্রাম ফল পাওয়া যায় প্রায় ১৫ বা ২০ বছর পর্যন্ত।

প্রোমোসনেল এবং বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্য
কেন্দ্রীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ কর্তৃক নির্দিষ্ট ভেষজ উদ্ভিদসমূহ

এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ মোট ৩২ (বত্রিশটি) ফসল নির্দিষ্ট করেছে। এগুলির বেশির ভাগ আমাদের রাজ্যে পাওয়া যায়। যেগুলি যে রাজ্যে পাওয়া যায় সেই রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট ফসল হতে হয়। নির্দিষ্ট ৩২টি ভেষজ উদ্ভিদ হল ঃ

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১। আমলা	এম্‌লিকা অফিসিনেলিস (**Emblica officinalis**)
২। অশোক	সারাকা অশোকা (**Saraka asoka**)
৩। অশ্বগন্ধা	উইথানিয়া সম্‌নিফেরা (**Withania somnifira**)
৪। অতীশ	একোনিটাম হেটারোফাইলাস (**Aconitum heterophyllum**)
৫। বেল	এইজেল মার্মেলোস (**Aegle marmelos**)
৬। ভূমি আমলকী	ফাইলানথাস এমারাস (**Phyllanthus amaras**)
৭। ব্রাহ্মী	বেকোপা মনিয়েরি (**Bacopa monnieri**)
৮। চন্দন	সান্তালাম এল্‌বাম্‌ (**Santalum albam**)
৯। চিরতা	সুয়েরিতা চিরতা (**Swerita chirata**)
১০। দারুহলদি	বেরবেরিস এরিস্টেটা (**Birbiris aristata**)
১১। গিলো	টিনোস্পোরা কর্ডিফলিয়া (**Tinospara cordifolia**)

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১২। গুড়মার	জিমনেমা সিলভেস্ট্রি (Gyn;nema sylvestre)
১৩। গুগ্গল	কমিফোরা উইটি (Commiphora wightii)
১৪। ঈসবগুল	প্ল্যান্টাগো ওভাটা (Plantago ovata)
১৫। জটামাংসী	নার্দোস্টাচিস জাতামন্সী (Nardostachys jatamansi)
১৬। কালিহারী	গ্লোরিওসা সুপার্বা (Gloriosa superba)
১৭। কালমেঘ	এন্ড্রোগ্রাফিস পেনিকুলেটা (Andrographis paniculata)
১৮। কেশর	ক্রোকাস সেটাইভাস (Crocus sativas)
১৯। কোকুম	গার্সিনিয়া ইন্ডিকা (Garcinia indica)
২০। কুথ	সৌসুরিয়া কস্টাস (Saussuria costus)
২১। কুটকী	পিক্রোরহিজা কুরোয়া (Picrorhiza kurroa)
২২। মকয়	সোলানাম নাইগ্রাম (Solanum nigram)
২৩। মুলেঠী	গ্লাইসিরহিজা গ্লেব্রা (Glycyrrhiza glabra)
২৪। সফেদ মাসলি	ক্লোরোফাইটাম বোরিভিলিয়ানাম (Chlorophytum borivillianum)

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
২৫। পথের চুর	কলিয়াস বার্বাটাস (Colius barbatus)
২৬। পিপুল	পাইপার লঙ্গাম (Piper longum)
২৭। সপর্গন্ধা	রাউলফিয়া সার্পেন্টিনা (Rauwolfia serpentina)
২৮। সেনা	কেসিয়া এ্যানগুস্টিফলিয়া (Cassia angustifolia)
২৯। শতমূলী	এসপারাগাস রেসিমোসাস (Asparagus racimosus)
৩০। তুলসী	ওসিমাম সেংটাম (Ocimum sanctum)
৩১। বৈ ভিদং	এম্বেলিয়া রিব্‌স (Embelia ribes)
৩২। ভৎস নভ	একোনিটাম ফেরক্স (Aconitum firox)

এ-ছাড়া যে-সব ভেষজ উদ্ভিদের নিশ্চিত বাজার আছে এবং স্থানীয় ভাবে ভালোভাবে উৎপন্ন করা যায় সেসব ভেষজ উদ্ভিদ চাষের জন্যও কেন্দ্রীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্যদের আর্থিক সাহায্যের জন্য স্কিম বা প্রকল্প পাঠানো যায়। এজন্য ত্রিপুরা রাজ্য ভেষজ উদ্ভিদ পর্যদ (প্রযত্নে বনবিভাগ ত্রিপুরা সরকার, পন্ডিত নেহেরু কমপ্লেক্স, পোঃ কুঞ্জবন আগরতলা) এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ত্রিপুরা রাজ্য ভেষজ উদ্ভিদ পর্যদ নির্বাচিত করেছে ৮টি ভেষজ উদ্ভিদকে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তার জন্য প্রথম দফায় নির্বাচিত করেছে এগুলি হল (১) আমলকী, (২) চন্দন অথবা আগর, (৩) সর্পগন্ধা, (৪) পিপুল, (৫) বচ (৬) শতমূলী, (৭) কালমেঘ (৮) চিরতা।

❒ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ভেষজ উদ্ভিদ চাষে আর্থিক সাহায্য ❒

২০০০ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক কর্তৃক **জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ** গঠিত হয়। পাশাপাশি তৈরি হয় প্রতি রাজ্যে **রাজ্য ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ**। এই পর্ষদের উদ্দেশ্য হল সব রাজ্য তথা ভারতে কী কী ভেষজ উদ্ভিদ পাওয়া যায় এবং কীভাবে সেগুলির বাণিজ্যিকভাবে চাষ করে গ্রাম পাহাড়ের চাষিদের অর্থনীতি উন্নত করা যায়। পাশাপাশি এদেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কী কী ভারতীয় বনৌষধি বিক্রি করা যাবে এবং আমাদের দেশের নিজস্ব পেটেন্ট তৈরি করে তা রপ্তানি করা যাবে তা খতিয়ে দেখা। এ-ছাড়া আরেকটি উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের গুণমান পরীক্ষা করে সেগুলির ব্যবহারিক গুণাগুণ যাচাই করে নানা প্রকার ঔষধ এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করার সুপারিশ করা।

যে-সব ভেষজ উদ্ভিদ চিরাচরিতভাবে আমাদের কবিরাজরা ভেষজ ঔষধের জন্য ব্যবহার করেন সে-সব ভেষজ উদ্ভিদের চাষের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অর্থ সাহায্য করা। এর সঙ্গে বনদপ্তর; কৃষি, উদ্যান ও ভূমিসংরক্ষণ দপ্তর এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক প্রযুক্তিগত এবং বিপণের সাহায্য করা।

বর্তমানে তিনটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অর্থ ও কারিগরি সাহায্য করছে ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ। স্কিম বা প্রকল্প হল—

(১) প্রোমোসনাল প্রকল্প বা স্কিম।
(২) বাণিজ্যিক প্রকল্প বা স্কিম।
(৩) চুক্তিভিত্তিক চাষ প্রকল্প।

১। প্রোমোসনাল স্কিম ঃ এই স্কীমে অর্থ সাহায্যের জন্য প্রজেক্ট পাঠাতে হলে নীচের যে-কোনো একটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্প তৈরি করতে হয়। যেমন—

(ক) কোনো অঞ্চলে ভেষজ উদ্ভিদের উপস্থিতি ও প্রাচুর্য সম্পর্কে সমীক্ষা করা।

(খ) (অ) নিজ নিজ অঞ্চলে প্রাপ্ত ভেষজ উদ্ভিদের চাষ করা।

(আ) লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এমন ভেষজ উদ্ভিদের লালনপালন করে বিভিন্ন অঞ্চলে তা যত্ন করে চাষ করে সংরক্ষণ করা।

(ই) অঞ্চলভিত্তিক ভেষজ উদ্ভিদের প্রদর্শনী বাগান তৈরি করা।

(গ) কৃষিপ্রযুক্তির উন্নয়নের সাহায্যে ভেষজ উদ্ভিদের ভালো জাতের এবং উন্নত ও পুষ্ট ধরনের বীজ, বীচন, কাটিং, তেউর ইত্যাদি তৈরি করা।

(ঘ) ভেষজ উদ্ভিদের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার জন্য সচেতনতা, খোঁজখবর বৃদ্ধি, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

(ঙ) ভেষজ উদ্ভিদের সংরক্ষণ গুদামজাতকরণ, ব্যাবসা ও বাণিজ্যিক ভিত্তিক পরিকাঠামো ইত্যাদি তৈরি করা।

(চ) ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালনা এবং সেগুলির উন্নয়নের প্রচেষ্টা করার প্রকল্প।

(ছ) (অ) ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদনকারী চাষিদের নিয়ে সমবায় তৈরি করা।

(আ) ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহকারীদের নিয়ে সমবায় তৈরি করা।

(ই) ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহারীদের দ্বারা ভেষজ উদ্ভিদের গুণমান ও মূল্য বাড়ানোর জন্য সমবায় তৈরি করা।

(জ) ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে কর্মরত বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহকে সহায়তা করা।

উপরের যে-কোনো একটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্প তৈরি করে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ থেকে। এজন্য স্কিম বা প্রকল্প বানিয়ে রাজ্য ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদে জমা দিতে হয় বছরের যে-কোনো সময়। রাজ্য বনবিভাগে (গোর্খাবস্তিতে) এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও সাহায্য পাওয়া যায়।

২। **বাণিজ্যিক স্কিম ঃ** এই স্কিমে নীচের যে-কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যে-কোনো প্রকল্প তৈরি করে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন—

(ক) বেশি পরিমাণ উন্নতমানের ভেষজ উদ্ভিদের চারা বা বীচন তৈরি করে বিক্রি করা।

(খ) নির্দিষ্ট ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ বা ভেষজ সামগ্রী উৎপাদন করা (অন্তত ২ হেক্টর বা সাড়ে বার কাণি/বিঘা জায়গায়।

(গ) উন্নত প্রথায় সংগ্রহ করা, গ্রেডিং করা, শুকানো, গোদামজাত করা ও সংরক্ষণ করণের দ্বারা ভেষজ উদ্ভিদ বা সামগ্রির অর্থনৈতিক মূল্য বাড়ানো।

(ঘ) ভেষজ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ সামগ্রীর বাজারজাতকরণের নতুন দিশা বা ব্যবস্থা চিহ্নিত করা।

৩। চুক্তিভিত্তিক চাষ প্রকল্পে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য নিয়ে স্কিম বা প্রকল্প জমা দিয়ে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য পাওয়া যায় ; যেমন—

(ক) সুনির্দিষ্ট ভেষজ উদ্ভিদের চাষের এলাকা বৃদ্ধি করা।

(খ) ভেষজ উদ্ভিদের সুনির্দিষ্ট ও চলতি বাজার পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা।

ভেষজ উদ্ভিদের সমীক্ষা, চাষ, উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদির জন্য সাহায্যের পরিমাণ—

(১) প্রকল্পের মোট খরচের শতকরা ৩০ ভাগ যা মোট ৯ লক্ষ টাকার বেশি হবে না।

(২) প্রকল্পের মোট খরচের কিছু অংশ পাওয়া যাবে—

(ক) সমবায় বা কো-অপারেটিভ সমিতি থেকে।

(খ) উপজাতি/তপশিলিজাতি উন্নয়ন পর্ষদ থেকে।

(গ) রাষ্ট্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা নাবার্ড থেকে।

(ঘ) নাবার্ড অনুমোদিত অন্যান্য ব্যাঙ্ক থেকে।

তবে প্রোমোসনাল প্রকল্পগুলির জন্য ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ সম্পূর্ণ (১০০%) প্রকল্প খরচ বহন করে। এ-ছাড়া প্রকল্পের পরিকাঠামো তথা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিশেষজ্ঞ এবং কর্মচারীদের নূন্যতম মাসিক এবং বাৎসরিক ব্যয়ভারও বহন করে থাকে। এজন্য সমবায় সমিতি বা সামাজিক সংস্থা বা ভলান্টারি সংস্থা (এন.জি.ও) এবং রাষ্ট্রীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদ এর মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে কাজ শুরু হয়।

• আর্থিক সাহায্যের জন্য দরখাস্তের নমুনা •

(১) প্রকল্পের নাম ....

(২) দরখাস্তকারীর পুরা ঠিকানা ....

(৩) দরখাস্তকারীর পেশা/বৃত্তি ....

(৪) প্রকল্পের সময় ....

(৫) চাষের জন্য নির্বাচিত ভেষজ উদ্ভিদের নাম ....

(৬) চাষের এলাকা ....

(৭) প্রকল্পের সার্থকতার যুক্তি ....

(৮) আর্থিক ও পরিকাঠামোগত প্রয়োজনের পরিমাণ ....

(৯) মোট খরচের হিসাব—

(ক) প্রকল্পের মোট খরচ ....

(খ) নিজস্ব খরচ ....

(গ) ব্যাঙ্ক ঋণ ....

(ঘ) জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদের অনুদান ....

উপরে বর্ণিত বিবরণ সজ্ঞানে সত্য। কেন্দ্রীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষদের নিয়মনীতি সুষ্ঠ মতে মেনে চলব। প্রকল্প অনুসারে অনুদান খরচ করা হবে। এই ব্যাপারে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার বা সংস্থা থেকে কোনো আর্থিক অনুদান চাওয়া হয়নি এবং কোনো সাহায্য পাওয়াও যায়নি।

—স্বাক্ষর